দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ৩ জুন ২০১৯।। ১৯ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



আবার মোদী সরকার

পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়, বেসামাল শাসকদল



বাবুল সুপ্রিয়
আসানসোল



দিলীপ ঘোষ
মেদিনীপুর



লকেট চ্যাটার্জি
হুগলী



জগন্নাথ সরকার
রানাঘাট



দেবশ্রী চৌধুরী
রায়গঞ্জ



কুনার হেমব্রম
ঝাড়গ্রাম



নিশীথ প্রামাণিক
কোচবিহার



রাজু বিস্তা
দার্জিলিং



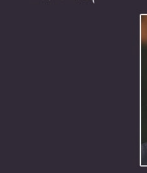
অর্জুন সিংহ
ব্যারাকপুর



জয়ন্ত রায়
জলপাইগুড়ি



জন বার্লা
আলিপুরদুয়ার



এস এস আহলুওয়ালিয়া
বর্ধমান-দুর্গাপুর



সৌমিত্র খান
বিষ্ণুপুর



শান্তনু ঠাকুর
বনগাঁ



জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাত
পুরুলিয়া



খগেন মুর্মু
মালদা উত্তর



ডা: সুভাষ সরকার
বাঁকুড়া



ড. সুকান্ত মজুমদার
বালুরঘাট

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৩ জুন - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রামের নাম নিন, ভূত পালাবেই ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করল ভারতের গণতন্ত্র অত্যন্ত মজবুত ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৭

মোদীর নির্বাচনী জয় জাতির আশা ও গর্বের প্রতিফলন ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৮

নতুন এক ভারতবর্ষের দিকে ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১১

আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১৩

মমতা-গোরু-ক্ষমতা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১৫

হিন্দুত্বের জাগরণ সন্ত্রাসী শক্তিকে রুখে দিয়েছে ▯ সরোজ চক্রবর্তী ▯ ১৭

হার্মাদ রাজনীতির গালে গণতন্ত্রের থাপ্পড় ▯ ২৩

স্বাধীনতার পর রাজ্যে প্রথমবার কাজ করল 'হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক' ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৪

গেরুয়া ঝড়ে টালমাটাল সবুজের দম্ভ ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৬

অপ্রতিরোধ্য পশ্চিমবঙ্গেও গেরুয়া সুনামি— বিনাশের পথে তৃণমূল কংগ্রেস ▯ সনাতন রায় ▯ ২৮

জানাইষষ্ঠী : বাৎসল্যের রসঘন অনুষ্ঠান ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসব ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

বিজেপির জয়ের নেপথ্য কারিগর ▯ অরুণাভ সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

'রং দে মোহে কেশরিয়া' ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৮

বিরোধীরা স্বর্গত, ওঁদের আত্মার শান্তি কামনা করুন ▯ সৃজিত রায় ▯ ৪০

এবার নরেন্দ্র মোদীর গৌরবময় ভারতের দিকে যাত্রা ▯ অম্লান কুসুম ঘোষ ▯ ৪৩

হাওড়া জেলা আদালত ও আইনজীবীদের আত্মমর্যাদা ▯ আশিস কুমার মোদক ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ রঙ্গম : ৪২▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ চিত্রকথা : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১০ জুন
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১০ জুন
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা

বিপুল জনসমর্থনে ভর করে এন ডি এ দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর সাধারণ মানুষের অনেক প্রত্যাশা। কী সেই প্রত্যাশা? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে সরকারের কাছে মানুষের কিছু প্রত্যাশা সম্পর্কিত আলোচনা। সেই সঙ্গে নিয়মিত বিভাগের লেখাগুলি তো থাকবেই

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

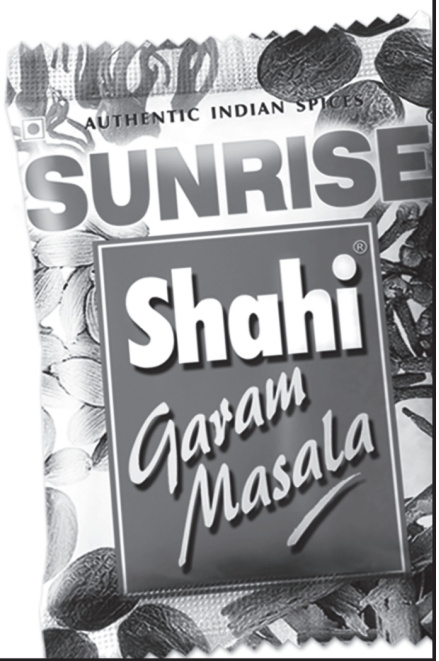
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

বিজয়ী ভারত

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা এনডিএ জোট বিপুল ভাবে জয়লাভ করিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ইহা শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ও তাহার জোটসঙ্গীর জয় নহে, ইহা ভারতের কোটি কোটি জাতীয়তাবাদী মানুষের জয়, ইহা ভারতবর্ষের জয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ভারত বিজয়ী হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পুর্বে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লইয়া সরকার গঠন করিয়াছিল। বস্তুত তাহা ছিল কংগ্রেসের নীতিপঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর রায়। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে দেশ পাইয়াছে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তিনি যাহা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে পূরণ করিয়াছেন। বিশ্বসভায় দেশকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের যেমন যেমন অগ্রগতি ঘটিয়াছে, বিপক্ষ দলগুলির গাত্রদাহ দ্বিগুণ ভাবে বাড়িয়াছে। সরকারের গঠনমূলক কাজের কোনও রূপ সমালোচনা করিতে না পারিয়া দেশের মানুষের মন নষ্ট করিবার খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা সরকারের বিরোধী হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিরোধীও হইয়া পড়িয়াছে। ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সরকারের বিরোধী পক্ষের ভূমিকায় দেশবিরোধী শক্তি উৎসাহিত হইয়াছে। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাই পূর্বেকার তুলনায় অধিক শক্তিতে তাঁহাকে পুনরায় নির্বাচিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার বা এনডিএ-র জয় নহে, ইহা ভারতের জনগণের জয়, ইহা ভারতের জয়।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল পশ্চিমবঙ্গবাসীর শুভবুদ্ধির উদয়। বিগত পাঁচ দশকে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হইয়াছে। তাহারা সুশাসনের লাভ পাইয়াছে। কিন্তু যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য হিন্দু বাঙ্গালি তাহার অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ পদ্ম ফুটাইবার আগ্রহ দেখায় নাই। বিগত পঁচিশ বৎসরে ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে দুইয়ের অধিক আসনে জয়লাভ করিতে পারে নাই। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বাঙ্গালির জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ঝুলিতে বাঙ্গালি এই বার ৪০ শতাংশ ভোট প্রদান করিয়া ১৮টি লোকসভা আসনে জয় আনিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বরণ করিয়া লইল। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছাড়া বাঙ্গালির আর কোনও উপায় ছিল না। চৌতিরিশ বৎসরের বাম শাসনে এবং সাত বৎসরের তৃণমূল শাসনে বাঙ্গালি সর্বদিক হইতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। শাসক দলের অত্যাচারে প্রতিদিন বঙ্গভূমি রক্তাক্ত হইতেছিল। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের গুন্ডা ও সমাজবিরোধীদের সীমান্ত অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের হিন্দু জনসাধারণের বিরুদ্ধে লেলিয়া দেওয়া সহ সমস্ত রকম অপকর্মের পীঠস্থান হইয়া পড়িয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ। বাঙ্গালি তাই মুক্তি পাইতে নরেন্দ্র মোদী ও তাঁহার দলকেই অবলম্বন করিয়াছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আশা করিতেছেন পশ্চিমবঙ্গ এইবার রাহুমুক্ত হইবেই।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হইয়া নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাচীর হইতে দেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, 'হম ন খায়েঙ্গে অউর ন খানে দেঙ্গে'। ইহাতে দেশবাসীর আশাভরসা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতির বড়ো অংশ পূরণ করিয়াছেন। বাকি অংশ পূরণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার নব নির্বাচিত সাংসদদের সামনে সংকল্প করিয়াছেন—' কাজ করিবার সময় কিছু ভুল হইয়া যায়, কিন্তু অনিষ্টকারী ও খারাপ কিছু করিব না। নিজের জন্য কিছু করিব না, শুধু দেশের জন্যই করিব। আমার এই প্রতিটি মুহূর্ত এবং আমার শরীর দেশের জন্যই নিবেদিত।' তিনি নিজেকে একজন ফকির বলিয়াছেন। এহেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দেশ ভরসা রাখিয়াছে। রাজনৈতিক বিরোধী এবং দেশ বিরোধীশক্তির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেশবাসী বিপুল শক্তিতে তাঁহাকে পুনর্নির্বাচিত করিয়াছে। সপ্তদশ লোকসভায় জয় লাভ করিয়াছে নূতন ভারত। বিজয়ী হইয়াছে ভারতবর্ষ।

সুভাষিতম্

বাণী রসবতী যস্য যস্য শ্রমবতী ক্রিয়া।

লক্ষ্মীঃ দানবতী যস্য সফলং তস্য জীবিতং।।

যে মানুষের বচন মধুর, যাঁর কার্য পরিশ্রমযুক্ত, যিনি ধন দান করেন, তাঁর জীবন সর্বাংশে সফল।

রামের নাম নিন, ভূত পালাবেই

বিশ্বামিত্র-র কলম

রামের নামে যে ভূত পালায়, সে তো কোন ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি। এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে হোয়াটস অ্যাপ, টুইটার, ফেসবুকের যুগে অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার এমন সর্বোত্তম যুগে পৌছিয়ে ভূত তাড়াতে ওঝার দরকার যে নেই, স্রেফ রাম নামই কাফি, সত্যি বলতে কী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় না এলে বোঝার উপায় ছিল না। আচ্ছা, রাম কী বা কে? জানেন, নিজের মনে প্রশ্নটা বারবার করেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। জন্মানো ইস্তক দেখে আসছি গুনতি থেকে শুরু করে শুভ কাজ, সবেরই সূচনা 'রাম' নামে। এখন ব্যবহার কমেছে। কিন্তু এককালে নামের ক্ষেত্রেও রামের ব্যবহার ছিল একামেবাদ্বিতীয়ম্। হাতে গরমাগরম উদাহরণ রাজা রামমোহন রায় থেকে রামজয় বিদ্যালঙ্কার, মায় সীতারাম ইয়েচুরি পর্যন্ত এমনই অজস্র উদাহরণ।

রামমোহনের নাম নিতেই সাম্প্রতিক একটি বিতর্কের কথা মাথায় এল। পায়েল রোহতগি বলে এক অভিনেত্রী রামমোহনকে ব্রিটিশদের 'চামচা', সতীদাহ প্রথা নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করেছেন, তাঁর ট্যুইটারে। তাঁর ন্যূনতম ইতিহাসবোধ নেই, ইতিহাস জানেনও না কিছু— এমন অর্বাচীনের মতো মন্তব্যে তাঁর মূর্খামিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং সংবাদমাধ্যমে পায়েলের এই বক্তব্য ভাইরাল হতেই 'পলিটিক্স' শুরু হয়ে গিয়েছে, চিরাচরিত ছকে। এই 'পলিটিক্স'-এর হিসেবে পায়েল 'নরেন্দ্র মোদীর ভক্ত', 'বিজেপি-আর এস এস অনুগামী'। কেউ কেউ 'মনুবাদী' বলেও কটাক্ষ করেছে।

এসবের হিসেব নিকেশ পরে দিচ্ছি। কিন্তু পায়েলের এই মন্তব্য আসার দিনকতক আগেই, রাজা রামমোহনের জন্মদিন (২২ মে) উপলক্ষ্য করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল আধুনিক মহাপুরুষদের বাণী। যার মর্মার্থ হলো জয় শ্রীরাম না বলে বরং 'জয় শ্রীরামমোহন' বলা হোক। কারণ রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করে নারীজাতিকে উদ্ধার করেছিলেন, অন্যদিকে রাম সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করে নারীজাতিকে অপমান করেছেন ইত্যাদি। সুতরাং প্ররোচনায় ইন্ধন শুরু হয়েছিল মোক্ষম মুহূর্তে, আর পায়েল রোহতগির অনৈতিহাসিক মন্তব্যও ঠিক সেই মোক্ষম সময়ই। কেন জানি না, মোদীজী সেই ২০১৪-তে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুয়ে দুয়ে চারের মতো পাটিগণিতের সব জটিল অঙ্ক কেমন করে যেন মিলে যায়। সে জেএনইউ-য়ে আফজল গুরুর জন্মদিন পালনই হোক, বা অতি সম্প্রতি বিদ্যাসাগর কলেজে মূর্তি ভাঙা। জয় বাঙ্গলা।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, 'জয় বাঙ্গলা'বাদীরা অপেক্ষার সদ্ব্যবহার করতে বিশেষ দেরি করেননি। সত্যি কথা বলতে কী, মোদী কেবল ভারতবর্ষে জিতলে তাদের বুকে এতটা শক্তিশেল বিঁধত না, যতটা বিধেছে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি বাঙ্গলায় রমরম করে (ওটা বোধহয় রামরামই হবে) মোদীর দল জিতে যাওয়ায়। যে বাঙ্গলার জন্য তাঁদের প্রাণ সর্বদা কেঁদে-ককিয়ে ওঠে, মুসলমান সমাজ যেমন আরবীয় থেকে দিব্যি বাঙালি হয়ে গিয়েছে, অনেকটা সেই বাংলাদেশীয় কায়দায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হিন্দুগুলো বুঝলে হয়। এঁদের মহীয়সী নেত্রী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে তেড়ে উঠে বলেছিলেন, 'গালাগাল দিচ্ছিস কেন?' ভোটবাক্সে বোঝা গেল গ্রামবাঙ্গলা তার শাশ্বত চিরন্তন রূপটি আজও ধরে রাখতে পেরেছে।

রামের নাম এখনও যে কোনও শুভ কাজে সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। তাই গজ্জু (অর্থাৎ গুজরাটি নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা কেবল ব্যক্তি বিরোধিতাতেই হিসাব চোকায়নি, একটি সমগ্র জাতি-সম্প্রদায়কেও অপমান করতে শিখিয়েছে) গুটকাখোরের দলের সংস্কৃতি হিন্দু বাঙ্গালি নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে এমন দিন দেখার আগেই মরে যাওয়াই ভালো বোধহয়!

আসলে বাঙ্গলা-পক্ষ বুঝতে পারেনি রামের নাম বাঙ্গলার সনাতন পরম্পরাই অঙ্গ। আরবি সংস্কৃতিকে চাপানোর চেষ্টা বাঙ্গালি ভালো চোখে নেবে না। আজ রাজা রামমোহন রায় যদি দেখতেন তাঁর নাম করে বাঙ্গলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতলব হচ্ছে তবে তিনিই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেতেন। অবশ্য বাঙ্গালির গত সাতের দশক থেকে যে হাল আমরা দেখেছি, মনীষীরা দেখলে তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হতো। আজ ঠেলায় পড়ে যারা বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রেমী হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক পূর্বজরাই সাতের দশকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল, রামমোহনকে 'বুর্জোয়া', 'ব্রিটিশের দালাল' বলেছিল।

প্রশ্নটা শুরু হয়েছিল রাম কী বা কে দিয়ে। রামায়ণকে যাঁরা অস্বীকার করেছে, ইতিহাস বলে মানতে চায়নি সেই ভারত-বিদ্বেষী বামপন্থী ঐতিহাসিকদের আমরা সবাই চিনি। এরাই জনজীবনে রামের অবিসংবাদিত প্রভাব দেখে কখনো রাম-রাবণের যুদ্ধে আর্য অনার্য থিয়োরি এনেছে, কখনও রামকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিভূ, কখনও বা তাঁকে শূদ্র শম্বুক হত্যার দায়ে জনজাতি বিরোধী বলেও মন্তব্য করেছে। রামায়ণের ঐতিহাসিকতাতেও রামকে ঠাহর করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের জনজীবনেও তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

ভারত আর বাঙ্গলাকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আটকে রেখেছে, বাঙ্গলাকে আরবীয় সংস্কৃতিতে লীন হয়ে যেতে দেয়নি। সুতরাং বিপদে পড়লেই রামের নাম নিন, ভূত পালাবেই। সে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রই হোন, কিংবা রাজা রামমোহন। ■

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করল ভারতের গণতন্ত্র অত্যন্ত মজবুত

মনীন্দ্রনাথ সাহা

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন শেষ এবং ফলও প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই ভোটে জয়লাভ করেছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। সারা দেশে এনডিএ পেয়েছে ৩৫০, ইউপিএ ৯০, অন্যান্য পেয়েছে ১০২টি আসন। এরাজ্যে বিজেপি ১৮, তৃণমূল ২২ ও কংগ্রেস ২টি। ভোটের আগে থেকে রাজ্যের শাসকদলের স্লোগান ছিল 'দু'হাজার উনিশ, বিজেপি ফিনিশ'। এছাড়া বলা হতো 'বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ'। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা গেল বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ তো নয়ই, বরং বাইশ। আর বিজেপি ফিনিশ তো নয়ই, বরং তৃণমূলের ঘাড়ের উপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে।

কিন্তু হঠাৎ কী এমন হলো যে—চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের জগদ্দল পাথরকে বাঙ্গলা থেকে সরানোর জন্য মানুষ যাঁর হাত ধরে বাঙ্গলায় পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন সেই হাত ছেড়ে বাঙ্গলার মানুষ বাঁচতে চাইছেন কেন? মানুষ তৃণমূলের প্রতি এত ক্ষিপ্তই বা হয়ে উঠছে কেন?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই রাজ্যে রিগিং শব্দটি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে ভোট রাজনীতিতে প্রবেশ করে। এর উপর ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে মানুষের ক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর তৎকালীন শাসক কংগ্রেস দলের ন্যাক্কারজনক আক্রমণ। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, মিসা, ডিআইআর-সহ কালা কানুনে নির্বিচারে গ্রেপ্তার পরিস্থিতিকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সেসময় বামেরা ক্ষমতায় এসে অভিনব বৈজ্ঞানিক রিগিং প্রয়োগ করে নিজেদের আধিপত্যকে কায়েম রেখেছিল। বামেদের আমলেই বিরোধী দলের এজেন্টদের উপর হামলা শুরু হয়। বিরোধী দলের কোনও এজেন্ট ভোটের দিনে বুথে থাকবে না, এটাই ছিল বামেদের নির্বাচনে জেতার কৌশল।

২০১১ সালে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, তখন থেকে ২০১৬ সালের মধ্যেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত বিরোধী দল না পাওয়ায় মানুষ তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু শেষ দু'বছরে বাঙ্গলার রাজনৈতিক চালচিত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ তীব্রভাবে ব্যক্ত হতে শুরু করে। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই চিত্র প্রায় একই রকম। তৃণমূলের রাজত্বে মানুষ বড় অসহায়। কাজ নেই, শিল্প নেই, নিরাপত্তা নেই, হাসপাতালে চিকিৎসক নেই, আইনের শাসন নেই, নিরাপত্তা নেই, আক্রান্ত ও অত্যাচারিতদের বিচার পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসীদের বাড়বাড়ন্ত। তারা রাজ্যে নিশ্চিন্তে সন্ত্রাস চালালেও সরকারের মদত পায়। দলের তরফ থেকে শুধুই জুলুম, তোলাবাজি, লুঠ এবং প্রতারণার অভিযোগে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ।

বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে মনোনয়নে বাধা, ভোটের দিন বুথ দখল ও ছাপ্পাভোট এবং গণনা কেন্দ্রে গুন্ডামি ও জালিয়াতি এই ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রধান কারণ।

সারাদেশে সাত দফায় নির্বাচন হয়েছে। প্রায় ১০০ কোটি মানুষ এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। কোথাও নির্বাচন ঘিরে কোনও অশান্তির খরব নেই দু' একটি বুথ বাদ দিলে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফা থেকে সপ্তম দফা পর্যন্ত প্রতিটিতেই অশান্তি শুধু নয়, বিরোধীদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ হয়েছে। এক কথায় রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বর্তমান সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে।

পুলিশ সরাসরি এই ভোট জালিয়াতিতে অংশ নিয়েছে, ভোটকর্মীদের হুমকি দিয়েছে। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক সৎ প্রিসাইডিং অফিসারকে অপহরণ করে হত্যা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। শাসক দলের মস্তানদের নির্দেশ মতো পুলিশকে কাজ করতে বাধ্য করেছে। এসবই ঘটেছে জনসমক্ষে। জনগণ ধরে নিয়েছেন যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে অবাধ ও সুষ্ঠ ভোটদান সম্ভব নয়। তাই তৃণমূলকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে, নইলে ভোটের নামে এই প্রহসন বন্ধ হবে না। ভোট দেওয়ার অধিকার যেকোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। তাই নিজের ভোট নিজে দেব এবং ভোট লুঠেরাদের রুখে দেব এই মনোভাব ক্রমেই জোরালো হচ্ছিল। লোকসভা ভোটের আগে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তা প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। আগামীদিনেও যদি রাজ্যের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সরব হন তা হলে পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব আবার ফিরে আসবে, এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

জনগণের আশীর্বাদে রাজ্যের বিরোধী দলের যে সমস্ত নেতা-নেত্রী সাংসদ নির্বাচিত হলেন তাদের দায়িত্ব কিন্তু বহুগুণে বেড়ে গেল। ভোটের দুঃখজনক স্মৃতি মুছে ফেলে সর্বশক্তি নিয়ে জনগণের পাশে না দাঁড়ালে তাঁরা কিন্তু আগামীদিনে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। তৃণমূলের যে সমস্ত সাংসদ নির্বাচিত হলেন তাঁরা আগের মতো যদি সম্প্রদায়িক বিভেদ ও হিংসা পরিত্যাগ না করেন তাহলে রাজ্যবাসী আগামীতে তাদের সমূলে উৎখাত করে ফেলবেন। ■

মোদীর নির্বাচনী জয় জাতির আশা ও গর্বের প্রতিফলন

অতিথি কলম



স্বপন দাশগুপ্ত

২০১৪ সালে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদমেজাজি সমালোচকদের চটজলদি প্রতিক্রিয়া ছিল যে, বিজেপি তো মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছে। ২০১৯-এ ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী দু'একটি রাজ্য বাদ দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর দেশজোড়া তুমুল বিজয় বার্তা দিয়েছেন, তারপর আগামী পাঁচ বছর শতাংশের হিসেব করে ওই সব ছেঁদো বক্তব্য যে আর শোনা যাবে না তা নিশ্চিত। অবশ্য বিধ্বস্ত বিরোধীদের মধ্যে ছুটকো ছাটকা কেউ কেউ EVM সংক্রান্ত কিছু মিউ মিউ চালালেও এই দ্বিতীয় দফায় মোদীর অবিসংবাদিত নির্বাচনী মান্যতা ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। ৩০৩ জন বিজেপি সাংসদের ভোট শতাংশের হিসেবে ৪১ এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে জোট সঙ্গীদের ৪৭ জন সাংসদ ও তাদের সংগৃহীত ৭ শতাংশ ভোট। দুয়ে মিলে ৪৮ শতাংশ ভোট ও ৩৫০ জন সাংসদ সন্দেহতীতভাবে বিজেপিকেই ২০১৯-এর সেরা বিজয়ীর মর্যাদা দিয়েছে। সাধারণত চুপচাপ থাকা নির্বাচকমণ্ডলী যে বিপুল সাফল্য মোদীকে এনে দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক পণ্ডিতরা ভয়ার্তভাবে হতবাক হয়ে গেছেন। সদা এই হট্টগোলের দেশে হম্বিতম্বিটা সব সময় মেনে চললেও রাজনৈতিক ঝড় ওঠার একটা চোরা স্রোত কিন্তু দৃশ্যমান হচ্ছিল। এক শ্রেণীর সমালোচক মোদী বিতৃষ্ণায় আটকে থেকে চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন। এই দলভুক্তরাই এখনও দেশবাসীর দেওয়া এই বিপুল জনমতকে তাঁদের তৈরি Idea of India-র বিরোধী বা সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষাকারী নয় বলে হাহুতাশ করছেন। তার কারণ বোঝা যায়। বাস্তবে মানুষ যে ভঙ্গুর জোট ও পরিবারবাদী রাজনীতিকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই সত্যকে অস্বীকার করে জনতার এই সিদ্ধান্তকে বিভ্রান্ত ভোটদাতাদের ন্যায়ের পথকে পরিত্যাগ করা বলে চাউর করা হচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় আমেথিতে রাহুল গান্ধী যে ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে তাঁর পরাজয় স্বীকার করলেন তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে। গণনা শেষ হওয়ার আগেই তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে যতটা ঔদার্যের না পরিচয় ছিল তার থেকে ঢের বেশি ছিল আমেথিবাসীর ওপর তীব্র বিশ্বাসঘাতকতাজনিত চাপা ধিক্কার।

একজন দৃঢ়চেতা নেতা ও শক্তিমান জাতির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমবিকাশ যথার্থই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরবর্তী ২৫ বছর ধরে ভারত কিছুটা তাল মিলিয়ে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, এটিকেই প্রায় জাতীয় দর্শনের পর্যায়ে তুলে এনেছিল। এই দায়সারা ভাবকে মোদী মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

> দেশবাসী নতুন এক ভারত নির্মাণের একচ্ছত্র ক্ষমতা নির্ভয়ে সমর্পণ করেছে মোদীর হাতে। এই বিষয়টা নিয়েই তুমুল আতঙ্কিত তাঁর ছিদ্রান্বেষীরা। কিন্তু তাঁকে এই ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা দিতেই হবে। আগামীদিনে এই ভারতভূমি আরও কতটা সুজলা সুফলা হয়ে উঠল তার ওপরই নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন।

বিমুদ্রীকরণ, জিএসটি চালু করা বা দুর্নীতিবাজদের ওপর বজ্র-আঁটুনি লাগানো সহজ কাজ নয়। এতে যে হিম্মত লাগে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে অপারগ বহু নেতারই তা ছিল না।

ঠিক এই মানসিকতা থেকেই জঙ্গি মনোভাবসম্পন্ন পড়শীর মোকাবিলা করতে এক ধরনের নিরাপদ কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে চলার যে ছলনা চলছিল তার বদলে বলদৃপ্ত প্রত্যাশা যে অনেক বেশি ফলদায়ী তা আজ প্রমাণিত। দেশের লালাট লিখন সম্পর্কে মোদীর এক গভীর অনুভব ও অভিনিবেশ আছে। বিগত ৫ বছরে এই ভাবনা যে তাঁর মধ্যে সদা জাগরিত ছিল তার প্রমাণ তাঁর সাম্প্রতিক প্রচার স্লোগানের সূত্র ধরেই বলা যায়—'মোদী আছে বলেই সম্ভব' (মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়)। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রথম দৃঢ়চেতা হয়ে দেশ শাসনের ইঙ্গিত রেখেছিলেন। মানুষ তাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিল।

এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বড় ধরনের শক্তিশালী নির্বাচনী জোটকে ধ্বস্ত করার পাশাপাশি এযাবৎ অপরিচিত পূর্বভারতের রাজ্যে গিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাফল্য কুড়িয়ে নিতে মোদী সক্ষম হয়েছেন। অবশ্যই এর জন্য দলের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল নির্বাচনী কার্যকর্তাদেরও ভূমিকা অনস্বীকার্য। চিরচারিতভাবে ক্ষমতাসীন সরকার তার আমলাতান্ত্রিকতার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে রাজনৈতিকভাবে জনতাকেন্দ্রিক হতে তাদের সচরাচর দেখা যায় না। অটলবিহারী বাজপেয়ী ও তাঁর শাসনকাল নিশ্চিতভাবেই প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি কিন্তু এই পথই অনুসরণ

করেছিলেন। মোদী অমিত শাহকে পাশে নিয়ে রাজ্যপাটের গুণগত পরিবর্তনগুলিকে সরাসরি জনতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। পরিবর্তনজনিত উত্তেজনাকে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। এক্ষত্রের দল ও সরকার পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা থাকায় তারা উজ্জীবিত বোধ করেছে। যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে বি জে পি বিগত নির্বাচনেই সাফল্যের শীর্ষ সীমা ছুঁয়েছিল, এবারেও সেখানে একই অবিশ্বস্য সাফল্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ থেকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সব রকমের ভোট ম্যানেজমেন্ট ছাড়াও এই নির্বাচন ছিল মানুষের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মনোমতো মানুষটিকে কাজের সুযোগ করে দিতে এক উন্মাদনার নির্বাচন।

ব্যাপক নির্বাচনী হিংসা এবং অধিকাংশ জায়গায় প্রায় অস্তিত্বহীন দলীয় সংগঠন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এক ধাক্কায় ৪০ শতাংশ জনতার ভোট ও ১৮টি আসন জিতে নেওয়া এর অকাট্য প্রমাণ। নির্বাচনী সাফল্যের সুর ছিল আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় গর্বের তালে বাঁধা। বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার সীমানা পেরিয়ে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে ঢুকে তাদের ধ্বংস করা ও মোদীর বারবার এই ধরনের প্রত্যাঘাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া নিশ্চিতভাবেই জাতির মধ্যে এক নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। বলীয়ান হয়েছিল জাত্যাভিমান। তবুও শুধুমাত্র জাতীয়তাবোধের পতাকা বাতাসে উড্ডীয়মান রাখলেই দেশের অভ্যন্তরে শক্তিসঞ্চয় করে নতুন রাজনৈতিক জোটবন্ধন ধ্বংস করা যেত না। কখনই নির্মূল করা যেত না জাতি বর্ণের ভিত্তিতে একজোট হওয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে। তৃণমূল স্তরে তাদের জীবনযাত্রার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারার কারণেই এই ফল। গত ৫ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী নিশ্চিত আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রাজনীতিবিদরাই তো চরিত্রগতভাবে প্রতিশ্রুতির কথা, আশার কথা বলে থাকেন। তফাত হচ্ছে মোদী



বলেছিলেন তিনি যা যা ইতিমধ্যেই মানুষের জন্য করতে পেরেছেন তার ওপর দাঁড়িয়ে। মানুষ তার নিজস্ব অর্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিল এই প্রবীণ নেতার কথাগুলি অধিকাংশই সত্য। তাই ভরসা রাখা প্রয়োজন। বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তাহার কিন্তু আদৌ কংগ্রেসের মতো ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতির সমাহার নয়। কংগ্রেস দলের মতো মাসে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার আকর্ষণীয় কিন্তু অলীক কোনো উপঢৌকনের হাতছানি দলের ইস্তাহারে ছিল না। বিজেপির তরফে এমন গালভরা প্রতিশ্রুতির আভাস কিছু রাজনৈতিকভাবে কোনো ক্ষতি করেনি। কেননা ভোটদাতারা সরকারের কাজকর্মকে বিচার করেছিলেন দলের সর্বাঙ্গীণ আচার আচরণের ভিত্তিতে। সরকারের উদ্দেশ্যের সততার নিক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রচারসভাগুলিতে বারবার বলেছিলেন দেশবাসী যেন তাঁর কাজের ন্যায়পরায়ণতাকে বিচার করে। আজকের এই অতুল নির্বাচনী সাফল্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ করা বিপজ্জনক। বাস্তবে দেশবাসী নতুন এক ভারত নির্মাণের একচ্ছত্র ক্ষমতা নির্ভয়ে সমর্পণ করেছে মোদীর হাতে। এই বিষয়টা নিয়েই তুমুল আতঙ্কিত তাঁর ছিদ্রান্বেষীরা। কিন্তু তাঁকে এই ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা দিতেই হবে। আগামীদিনে এই ভারতভূমি আরও কতটা সুজলা সুফলা হয়ে উঠল তার ওপরই নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন। ▮

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

রম্যরচনা

কটু সত্য

ক্লাসে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন— গ্রাম ও শহরের তফাত কী কী?

এক ছাত্র উত্তর দিল— গ্রামে কুকুর পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর গোরু পালন করা হয়। শহরে কুকুর পালন করা হয় আর গ্রামে গোরু যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। গ্রামে অশিক্ষিত লোকেরা গোরু চরায় আর শহরে শিক্ষিত লোকেরা কুকুর চরায়।

অন্য ছাত্রকে শিক্ষকের প্রশ্ন— অনাথ আশ্রম আর বৃদ্ধাশ্রমের পার্থক্য কী?

ছাত্র উত্তর দিল— অনাথ আশ্রমে পিতা-মাতাহীন ও গরিব লোকেদের শিশুরা থাকে আর বৃদ্ধাশ্রমে ধনী পুত্র-কন্যার বৃদ্ধ মা-বাবারা থাকে।

সভ্যতা ও সম্পর্ক

সভ্যতার গোড়ার দিকে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে গাছ থেকে টাটকা পাতার থালা বানিয়ে খেতে দেওয়া হতো।

সম্পর্কগুলো ছিল গাছের পাতার মতোই সবুজ।

পরে মাটির পাত্র ব্যবহৃত হতে লাগল।

সম্পর্কগুলো চলে এলো একেবারে মাটির কাছাকাছি।

কিছুদিন পরে কাঁসাপিতলের জমানা এলো।

সম্পর্ক ন-মাস ছ-মাসে চমকাতে লাগল।

কিন্তু যেদিন থেকে কাচের প্লেটে খাবার দেওয়া শুরু হলো, সেদিন থেকে অল্প আঘাতেই সম্পর্কগুলো ভাঙতে লাগল।

আর এখন তো শুধু কাগজ কিংবা থার্মোকলের থালা ব্যবহার হয়।

মানে জাস্ট ইউজ অ্যান্ড থ্রো। ব্যবহার হয়ে গেছে, এবার ছুঁড়ে ফেলে দাও...



উবাচ



“এবার রামমন্দির তৈরি হবেই। রামের কাজ পূর্ণ করতে হবে। আমাদের সকলের ভিতরই রাম বিরাজ করেন। কিন্তু তাঁর কাজ পূরণ করার ক্ষমতা কয়েকজনের হাতেই থাকে। সেই কাজ যাতে দেখাশোনা করা হয় তার জন্যও একজনের দরকার।”

মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আরএসএস

সম্প্রতি উদয়পুরে এক সমাবেশে বক্তব্য



“তৃণমূলের জন্ম হয়েছিল সিপিএম বিরোধিতা করার জন্য। এখন সিপিএম শেষ। তাই তৃণমূল কংগ্রেসও খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাবে।”

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে।



“আগামী পাঁচবছর জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনচেতনার মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের জনগণের সমস্যার সমাধান করতে হবে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি দেশকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে হবে।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নির্বচনী ফলাফলের পর গুজরাটে দলীয় কার্যালয়ে বক্তব্যে।



“লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক জয়ের পর জয়ের সমর্থকদের প্রতি আমার পরামর্শ যে, পরাজিত পক্ষের লোকেরা এর পরও যদি তাদের অ্যাজেন্ডা আঁকড়ে বসে থাকে তবে তাদের সঙ্গে তর্ক করা বা তাদের বোঝানোর কথা চার বছর পর ভাবুন। ততক্ষণ আমরা সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই।”

অনুপম খের
প্রখ্যাত
চলচ্চিত্রাভিনেতা

নির্বাচনী ফলাফলের পর এক টুইট বার্তায়।

নতুন এক ভারতবর্ষের দিকে

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

নতুন যুগ এসেছে ভারতবর্ষে। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ঘটিয়ে নতুন সরকার চাইছে 'সবকা বিশ্বাস'। ভীতি-অবিশ্বাসের গলি থেকে বের হয়ে আসুন ভারতের মুসলমান সমাজ। না হলে নতুন ভারত গড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিরের দ্যুতি সেই মুখমণ্ডলে। সাধারণ একান্নবর্তী পরিবারের জননী। ভারতজননী বলতে সাধ হয়। এরকম যাঁর অপার্থিব হাসি, তাঁকে অন্য কোন নাম দেব? আর ওই মাধুর্যের প্রতিমূর্তি যশোদা! নাগরিক উন্নাসিক আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁকে পুরুষ শাসিত সমাজের অত্যাচার-ক্লিষ্ট একটি বেদনাদীর্ণ নারী বলে আঁকা সম্ভব। সত্যি তো, বিবাহ রাত্রে যাঁকে তাঁর সদ্য বিবাহিত স্বামী পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যুক্ত হবার কথা জানিয়ে চলে গেছেন জীবনের বৃহত্তর ডাকে— তাঁর মতো নারী-দ্বেষী আর কে? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই যদি ইচ্ছা ছিল— তবে বিয়ে করার কী প্রয়োজন ছিল? পরিবারের চাপ অস্বীকার করতে পানেনি— শুধুমাত্র এই অজুহাত কতটা গ্রাহ্য বলতে পারব না। জগতে এমন আশ্চর্য ঘটে। মহারাজ শুদ্ধোধন তাঁর শাক্য রাজ্যে উত্তরাধিকারীকে তো এই ভাবেই বিবাহবন্ধনে সংসারবৃত্তে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও তো দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে চলে গেলেন গঙ্গার ওপারে কণ্টকনগর। উপেক্ষিতা যশোধরা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো কিছু চমৎকার আমাদের আধ্যাত্মিক গরিমায় মহোজ্জ্বল মাতৃভূমিতে আছে। তবে আজকের প্রসঙ্গ যশোদাবেনের নিরম্বু উপবাস। স্বামীর সাফল্য কামনায় এই ব্রত উদ্‌যাপন এক অন্য ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ সেই ভারতবর্ষ, যা 'নৃপতিরে শিখায়েছে' 'ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি, ধরিতে দরিদ্র বেশ।' অন্যদিকে ওই যশোদা বেন, সেমিনার জটলায় বেরিয়ে পড়েননি— ভাঙার চেয়ে রক্ষা— বেহুলার মতো, সাবিত্রীর মতো তাঁর যাত্রা, তাও কি নয় অন্য ভারতবর্ষের ছবি! দ্বিতীয়বার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ভারতের শাসনভার যাঁর হাতে এল— তিনি এই নতুন আদর্শকে তুলে আনলেন প্রতীকের মতো।

এবছর লোকসভায় মাতৃশক্তির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, অধিকার পেতে নেতিবাচক সংখ্যা নয়— ইতিবাচক সংকল্প জরুরি। ঘৃণা, লোভ, হিংস্রতম অপশব্দও আমরা শুনেছি। কত যে কালনেমির রাজ্য ভাগ হলো। কেউ সারি সারি হাতি আর নিজের মূর্তির সামনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সহাস্য নারী-নার্সিসাস হয়ে আবির্ভূত হলেন। দিকে দিকে ফ্লেক্স শোভিত সততার প্রতীক এল গেল। সকলের ভাষা শুনে মনে হলো নর্দমায় হয়তো দুর্গন্ধ একটু হলেও কম। এরাও নারী। তবে এরা কোন ভাঙনের পথে এসেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিচিত্র সব রাজনৈতিক ভাষ্য আমরা শুনেছি। বহুজন সমাজ নাকি দেশের ৮৫ শতাংশ। ব্রাহ্মণের উপবীত, ক্ষত্রিয়ের তরবারি আর বেনিয়ার তুলাদণ্ড হঠিয়ে আসুক 'শূদ্রযুগ'। সেটাই তো কাম্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাই চেয়েছিলেন নাকি? কিন্তু বহুজন সমাজের নামে টাকার মালাপরা হাস্যময়ী মহামায়া কি সেই আদর্শ মানেন? এক কথায় বলছি— না। ছিল সমাজবাদের যাদব-মুসলিম ঐক্যের ভাষ্য, রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে 'মাই ইক্যুয়েশন'। একই অঙ্ক ছিল বিহারে। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির প্রমাণিত অপরাধীরা যখন নরেন্দ্র দামোদর মোদীকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে তখন বিধাতাপুরুষ নিশ্চয় আড়ালে হাসেন। কালিদাস একেই ত্র্যম্বকের হাসি বলে থাকবেন। কংগ্রেস ছিল KHAM অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-হরিজন-আহির-মুসলমান ঐক্যের অঙ্ক। ছিল পরিবারতন্ত্রের বিচিত্র অহংকার। 'বুয়া-বাবুয়া'র বিচিত্র ঐক্যও ছিল। ১৯ জানুয়ারির ব্রিগেড ময়দানে 'ডিস্ভাত-সমাবেশ' ছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পঞ্জাব থেকে অসম— এক বহুরূপী সমাবেশ থেকে নানা ভাষায় কী যে হলো, দানা বাঁধলো না। আসলে নেতারা একত্র হয়ে হাতে হাত জড়ো করলেই জনতা এক হয়? না। নতুন এক ভারত উঠে আসছে। তারা জাতপাতে বিশ্বাস করে না। জীবনকে দেখে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। এই সব খণ্ড-বিখণ্ড, টুকরো-ছিন্ন করার অঙ্ক তারা ব্যর্থ করে দিল। নতুন ভারতের এই নতুন প্রজন্ম নেতা-নেত্রীদের মঞ্চ-নাটক অপছন্দ করেছে। জাতপাতের পাটিগণিত নয়, নতুন প্রজন্ম আমাদের দিশা দেখাচ্ছে অভিনব এক রসায়নে। এই রসায়ন আধুনিকতা আর চিরাচরিতকে মিশিয়ে নতুন ভারত নির্মাণ করেছে। আমরা ভাগ্যবান, নতুন ভারতকে নতুন মহাযুগের দিকে যাত্রাপথের সাক্ষী হবার সৌভাগ্য আমাদের হলো।

সবাই সংশয় ত্যাগ করতে পারেনি। অনেক অপপ্রচার হয়েছে। বিশেষত ভারতের সর্বত্র একটি প্রচার বিক্রীত গণমাধ্যম আর বিকৃত রাজনীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রচারটির দুটি দিক— দুধারী তলোয়ার বলা যায়। একদিকে বলা হলো নতুন রাজনৈতিক দলটি ভয়ংকর। তারা ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' তৈরি করবে। সমস্ত দলিতদের অপর (Out Caste) করবে

তারা। আর এই নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তঃসার হবে মনুসংহিতার মতো প্রাচীন রক্ষণশীল স্মৃতি ও শাস্ত্র। একথা কীভাবে বোঝা গেল? পশ্চিমে রিপাব্লিক পার্টির নেতা রামদাস আঠোয়ালে তো ড. বি আর আম্বেদকরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। তাঁকে সসম্মানে স্থান দিয়েছে এনডিএ। বিহারে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নেতা রামবিলাস পাসোয়ান, অনগ্রসর সমাজের নেতা নীতীশ কুমার কি এই নতুন ভারতের যৌথযাত্রায় কিছুমাত্র অপর? পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরুন। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-গোর্খা-তামাং-লিম্বু-ভুইমালী-কোচ-মেচ-রাভা-মদেশিয়া-দেশি-ধানুকী-গণেশতাঁতি; পশ্চিমবঙ্গে বাউড়ি-বাগদি -গোপ-মাহাতো-বনবাসীদের ঐক্য না ঘটলে বিজেপির এই ফল হতো না। একই কথা মতুয়া-নমশূদ্র-পৌণ্ড্র সমাজের পক্ষেও। এই বিপুল তথাকথিত নীচু সম্প্রদায় কেন রাজ্যের শাসক দলকে পরিত্যাগ করলেন? সারা দেশেও একই ঘটনার কথা আগেই বলেছি। কারণ একটাই— ভারত এখন নতুন মহাযুগে দুটি জাতিতে পরিণত হয়ে আসছে। এক— যারা উন্নয়নের সুফল পায়নি আর দুই— যারা অন্য অংশকে টেনে আনার দায় গ্রহণ করতে চায়। সরকারের কাছে বিপুল আশা। আশা করি এই সমন্বয় সাধন তাঁরা করতে পারবেন। হিন্দু কাউকে অপর করে না— সবার হস্তে পবিত্র হয় মাতৃ-অভিষেকের তীর্থবারি।

মিথ্যা প্রচারের চরম হয়েছে দেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের আশঙ্কায়। বিজেপি নাকি মুসলমান বিরোধী। ভাবাটা অমূলক নয়। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কী ছিল তখনকার পাকিস্তান আন্দোলনের দাবি— দ্বিজাতিতত্ত্ব। জিন্না -ইকবাল -ফজলুল হকদের প্রস্তাব ছিল ভারতীয় মুসলমানরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি। তাই তাদের আলাদা দেশ চাই। এই চুক্তি আমরা মানিনি। হিন্দু মহাসভার বীর সাভারকর বলেছেন, মুসলমানরা পৃথক থাকতে চাইলে থাকুন। পাকিস্তান হোক, কিন্তু আলাদা রাষ্ট্র যেন না হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের দেওয়া বিশেষ অরিরিক্ত ভোট নয়— সকলের জন্য এক ভোট থাকুক। ম্যাকডোনাল্ড প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ডের সুযোগ স্বেচ্ছায় অস্বীকার করে হিন্দু সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসেন ড. আম্বেদকর। তফশিলি জাতিকে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি বলেই তিনি 'পুনা চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেন। দেশবিভাগ নিয়ে তাঁর ' থটস্ অন পাকিস্তান' গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে মুসলমানদের দাবি মেনে পাকিস্তান হোক— সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সাত শতাংশ জনবিনিময় হোক।

দেশবিভাগ হয়েছে, কিন্তু বীর সাভারকর বা ড. আম্বেদকরের প্রস্তাব মানা হয়নি। উপরন্তু 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি'-র মতো অসার চুক্তি হয়েছে। ফলে পাকিস্তান, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারা অ-মুসলমান জনতার আগমন ঘটেছে ভারতে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই চুক্তির প্রতিবাদে নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আজকে মুসলমান সমাজকে নিছক 'ভোটব্যাঙ্ক' হিসেবে ব্যবহার করার সময় আদর্শহীন ভোটসর্বস্ব দলগুলি সেই মিথ্যা কাহিনি এবারকার নির্বাচনেও ব্যবহার করে মুসলমানদের মোদী-বিরোধী অন্ধতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হবার প্রাক্কালে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (এনডিএ)-এর নেতা নির্বাচিত হবার পরবর্তী ভাষণে নরেন্দ্র মোদী যা বলেছেন, তাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। মুসলমান সমাজের অধিকাংশকে ধর্মনির্ভর কুম্ভীপাকে ফেললেও বিগত শাসকবর্গ তো তাদের আধুনিক শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকাঠামো তৈরি করেনি। আজও যদি তারা এদেশে থেকে পাকিস্তানে বৃষ্টি পড়লে মাথায় ছাতা ধরে তাহলে মুশকিল। জাতীয় সংগীত গাইব না, বন্দে মাতরম্ বলব না, ভারতমাতার জয় বলতে জিভ শুকিয়ে আসবে— এমন হলে তো চলবে না!

উত্তর প্রদেশে এক মুসলমান মহিলা গত ২৩ মে তাঁর সন্তানের নাম রেখেছেন 'নরেন্দ্র মোদী'। উদ্দেশ্য হলো, সৎ ও চরিত্রবান হোক তাঁর সন্তান। নতুন যুগ এসেছে ভারতবর্ষে। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ঘটিয়ে নতুন সরকার চাইছে 'সবকা বিশ্বাস'। ভীতি-অবিশ্বাসের গলি থেকে বের হয়ে আসুন ভারতের মুসলমান সমাজ। না হলে নতুন ভারত গড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা না হলে কিন্তু ট্রেন ফেল করতে হবে। দ্বিতীয় পথ নেই। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এটা আর কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এই মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এক অবিসংবাদী নেতা এবং অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতির ময়দানে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কোনো নেতার অভ্যুত্থান ঘটবে সে সম্ভাবনাও কম। পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর দ্বিতীয়বার আরও বিপুল পরিমাণ জনাদেশ নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের নজির ভারতে তো বটেই, সারা বিশ্বেও কম। ভারতে এর আগে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকাল অতিক্রম করার পরও প্রথমবারের থেকেও বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে সফল হয়েছিলেন। তারপর নরেন্দ্র মোদী সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নিজেই নিজের অতীত রেকর্ডকে ভাঙলেন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এবার লোকসভায় একক শক্তিতে তিনশো পার; আর জোট হিসাবে এনডিএ সাড়ে তিনশো। বোঝাই যাচ্ছে, ২০১৪-য় যে মোদীঝড় সারা দেশে বয়ে গিয়েছিল, এবার সে ঝড় আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে ২০১৪ সালে সে অর্থে মোদী ঝড় তেমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এবার সেই রাজ্যও মোদী ঝড়ে গেরুয়াময়। পশ্চিমবঙ্গই এবার নরেন্দ্র মোদীকে ১৮ জন সাংসদ উপহার দিয়েছে। জনসঙ্ঘ এবং তার পরে বিজেপির ইতিহাসে যা এই প্রথম। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন নিঃসন্দেহে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কিন্তু তার পাশাপাশি এই নির্বাচনই প্রমাণ করে দিয়েছে রাজনীতিবিদ হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর উচ্চতা এবং যোগ্যতা।

এবারের নির্বাচনই প্রথম, যেখানে কোনো রাজনৈতিক শক্তি নয়, একজন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি-সহ দেশের তাবৎ বিরোধী নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রবাবু নাইডু থেকে শারদ পাওয়ার, লালুপ্রসাদ থেকে মায়াবতী, অখিলেশ যাদব থেকে সীতারাম ইয়েচুরি— সকলের লক্ষ্য ছিল একটিই তা হলো নরেন্দ্র মোদী। সকলেরই মুখে ছিল একটিই হুংকার— মোদী হঠাও। বিগত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এদের সুর ক্রমাগত চড়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্কের বদলে নিম্নমানের ব্যক্তিগত আক্রমণের পথকেই বেছে নিয়েছেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে 'তুই তোকারি' সম্বোধন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। 'চা-ওয়ালা' থেকে

দেশকাল

'চোর' কোনোরকম ব্যঙ্গ এবং কুৎসা নেই যা বর্ষিত হয়নি প্রধানমন্ত্রীর ওপর। একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এরকম লাগাতার কুৎসা প্রচার করা হয়েছে, এটিও কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন।

আঞ্চলিক দলগুলি মূলত ব্ল্যাকমেলিংয়ের রাজনীতি করত। সেই ব্ল্যাকমেলিংয়ের রাজনীতিটি এবার বন্ধ হবে।... অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো আঞ্চলিক নেত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না।

অন্যদিকে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর বিগত পাঁচ বছর এই লাগাতার কুৎসা এবং মিথ্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে একদিনের জন্যও তাঁর ধৈর্যের বাঁধে ফাটল ধরেনি বা একদিনের জন্যও তিনি আত্মবিশ্বাস হারাননি। সংবাদমাধ্যম যখন লাগাতারভাবে প্রচার করে গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাবে না— তখনও নিজের আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন মোদী। বলেছেন, এবার মোদী ঝড় আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে দেশে। একজন আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল রাজনীতিক কেমন হতে পারেন তা প্রমাণ করেছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। অবশ্য তিনি পাশে পেয়েছেন অমিত শাহের মতো একজন যোগ্য সেনাপতিকে। ২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদীর বিপুল জয়ের পিছনেও যেমন মূল কারিগর ছিলেন অমিত শাহ, ২০১৯-এও এই ঐতিহাসিক জয়ের পিছনেও মূল কারিগর তিনিই। গত পাঁচবছর ধরে দলের সংগঠনটি বিস্তার এবং সুদৃঢ় করার দিকে সতর্ক সৃষ্টি রেখেছেন অমিত শাহ। তবুও মাঝে এমন আওয়াজও উঠেছিল, মোদী এবং শাহের ম্যাজিক শেষ। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অমিত শাহ প্রমাণ করে দিয়েছেন— ভোটযুদ্ধে তাঁর মতো দক্ষ সভাপতি বিজেপি ইতিপূর্বে পায়নি। ভবিষ্যতে পাবে কিনা— তা নিয়েও সংশয় আছে। ফলে, যে যাই বলুক না কেন এটা নিশ্চিত যে, বিজেপিতে মোদী-শাহ যুগ আরও বেশ কয়েক বছর অক্ষুণ্ণ থাকবে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর জাতীয় রাজনীতির অভিমুখটাই অনেকটা বদলে গিয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক কংগ্রেসের কথা। গান্ধী পরিবারের দুই সন্তান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বে কংগ্রেস এবার নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। নির্বাচনের বেশ আগে থেকেই কংগ্রেস বিশেষত রাহুল গান্ধী এবার নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ছিলেন। নোটবন্দি থেকে রাফাল— সব বিষয়েই নরেন্দ্র মোদীকে

কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' আওয়াজ তুলতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। এবং এই নির্বাচনী যুদ্ধের আগে থেকেই মোদী বিরোধিতায় তিনি পাশে পেয়েছিলেন অখিলেশ যাদব, চন্দ্রবাবু নাইডু, শারদ পাওয়ার, মায়াবতী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওমর আবদুল্লা, লালুপ্রসাদ, সীতারাম ইয়েচুরির মতো বিরোধী নেতাদের। নির্বাচনের মুখে মুখে অবশ্য তাঁকে সাহায্য করতে আসরে অবতীর্ণ হন ভগ্নী প্রিয়াঙ্কা। সংবাদমাধ্যমও সর্বশক্তি নিয়ে রাহুল গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে জনগণের সামনে তুলে ধরতেও সংবাদমাধ্যমের কোনো কসুর ছিল না। কিন্তু এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্ব দেশের দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের কোনো বক্তব্যই দেশের বিশ্বাস করেনি। সেই সঙ্গে দেশের মানুষ এও বুঝিয়ে দিয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসাবে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা তাদের পছন্দ নয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট যখন সাড়ে তিনশো আসনসংখ্যা ছুঁয়েছে, তখন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জোটের আসনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশের কিছু বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই শোচনীয় ফলাফলের পর রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। বিজেপি বিরোধী দলগুলির অনেকের ভিতরই রাহুলের নেতৃত্ব সম্পর্কে আগেই কোনো আস্থা ছিল না। এই ফলাফলের পর রাহুল গান্ধীকে বিরোধী শিবিরের নেতা হিসাবে আর কেউই মানতে চাইবে না। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসও আর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে না। এই ফলাফলে এটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, নেহরু- গান্ধী পরিবারের পরিচয় ভাঙিয়ে কংগ্রেস আর নির্বাচনে জেতার অবস্থায় নেই। সেক্ষেত্রে, এরপর কংগ্রেসের ভিতরেও যদি নেহরু-গান্ধী পরিবারের নেতৃত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্বাধীনতার পর থেকে এমন শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন কংগ্রেস ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

এবারের নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে এনেছে। তা হলো, আঞ্চলিক দলগুলির ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক রাজনৈতিক রমরমার অবসানের ইঙ্গিত। আশির দশকের শুরু থেকে এই দেশে আঞ্চলিক দলগুলি যেভাবে জাতীয় রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর মনে হচ্ছে, সেই প্রভাব একেবারেই খর্ব হবে। এবার নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী ও অখিলেশের জোট বিরোধী শিবিরে অনেকটাই আশার সঞ্চার করেছিল। এবং বিরোধী নেতা-নেত্রীরা ভেবেই নিয়েছিলেন বুয়া-ভাতিজার এই জোট উত্তরপ্রদেশে বিজেপির আসন কমিয়ে দেবে এবং বিরোধী জোটের সরকার গড়ার পথ প্রশস্ত করবে। এ ব্যাপারে বিরোধী নেতা-নেত্রীরা এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরদিন তারা দিল্লিতে বৈঠকে বসার প্রস্তুতিও নিতে চেয়েছিলেন। ফল বেরতে অবশ্য দেখা গেল উত্তরপ্রদেশে বুয়া-ভাতিজা কুপোকাত হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন-সমাজবাদী পার্টির ছড়ি ঘোরানোর আশাও ধূলিসাৎ হয়েছে। একই অবস্থা অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুরও। একদা এনডিএ শরিক এই নেতাটি এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন। বিরোধী জোট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ফলাফল বেরনোর পর দেখা গেল, লোকসভা তো অধরাই, রাজ্য বিধানসভাও হাতছাড়া হয়েছে চন্দ্রবাবুর। একেই বলে ঘটি-বাটি চাটি হওয়া। বিহারের লালুপ্রসাদ ও তাঁর পরিবারেরও এবার ভোটযুদ্ধে সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসার জোগাড়। কর্ণাটকের দেবেগৌড়ার জেটিএস এখন অস্তিত্ব সংকটের মুখে। আর রইলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সদর্পে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই রাজ্যের ৪২টার ভিতর ৪২টা আসনই তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস দখলে রাখবে। নির্বাচনী যুদ্ধে তিনি নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে 'এক্সপায়ারি প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। এমনকী, নির্বাচনের পর তিনিই হবেন বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী--- এমন স্বপ্নও দেখছিলেন। ফল বেরতে দেখা গেল, ৪২ তো দূরের কথা, তাঁর দলের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে ২২-এ। আর বিজেপি লাভ করেছে ১৮টি আসন। জাতীয় রাজনীতিতে কোনোরকম প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা এখন আর নেই তৃণমূল নেত্রীর। বরং, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পশ্চিমবঙ্গে নিজের দলের অস্তিত্ব রক্ষা করাই তাঁর সামনে এক বড়ো পরীক্ষা। কেননা, ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে, তাঁর দল ভেঙে এক বড়ো সংখ্যক বিধায়ক বিজেপির দিকে পা বাড়াতে পারেন। তাছাড়া জেলায় জেলায় ইতিমধ্যেই দল বদলের একটি হিড়িকও উঠেছে।

আঞ্চলিক দলগুলির এই সর্বনাশ জাতীয় রাজনীতিকে অনেক স্বচ্ছ এবং সাবলীল রাখতে সক্ষম হবে। ব্যক্তি স্বার্থে পরিচালিত এই আঞ্চলিক দলগুলি মূলত ব্ল্যাকমেলিংয়ের রাজনীতি করত। সেই ব্ল্যাকমেলিংয়ের রাজনীতিটি এবার বন্ধ হবে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারও অনেক সাবলীল ভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো আঞ্চলিক নেত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না। কোনো অন্যায্য চাপের কাছে নরেন্দ্র মোদীকেও মাথা নোয়াতে হবে না।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে এক আকাশছোঁয়া সাফল্য লাভ করেছে বিজেপি। এই সাফল্যের পাশাপাশি বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, আগামী পাঁচ বছর বিজেপিকে সেইসব প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে, যে প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের প্রচার পর্বে তারা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে অমিত শাহ বলে গিয়েছিলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মনুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে বিজেপিকে। সেই সঙ্গে আরও দুটি আশু কর্তব্য— ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু— এই কাজগুলির এবার করে দেখাতে হবে বিজেপিকে। তাহলেই এই বিপুল জনাদেশের মর্যাদা দিতে পারবে বিজেপি। নচেৎ নয়। ■

মমতা-গোরু-ক্ষমতা

দিদি আপনি যে গোরুর দুধ খান তাদের আর কতদিন গোরু বানিয়ে রাখতে চান। উন্নয়নের ডাকে সাড়া দিয়ে আর আপনার বঞ্চনার জবাব দিতে গিয়ে তারা দুধ দেওয়া যেদিন বন্ধ করবে সে দিনটার মুখোমুখি হতে পারবেন তো?

সুন্দর মৌলিক

ভোট বিপর্যয়ের নৈতিক দায় মাথায় নিয়ে কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যাও যে তেমন করতে পারেন সেই আশঙ্কা দলের মধ্যে ছিলই। হলোও তাই। নির্বাচনী বিপর্যয়ের ঠিক পরের শনিবার কালীঘাটে দলের সব জেলা সভাপতি, লোকসভা ভোটে জয়ী সব সাংসদ, হেরে যাওয়া প্রার্থী এবং মন্ত্রীদের বৈঠকে ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শুরু হয় নাটকীয় ভাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়াতেই বলেন, নির্বাচন কমিশনের জন্য তিনি সরকারের কাজই বহুদিন ধরে করতে পারছেন না। এভাবে কাজ করা যায় না। ক্ষমতাহীন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকতে চাই না। চেয়ার ইজ নাথিং ফর মি। আমি দলের সভাপতি হয়ে কাজ করতে চাই।

মমতার যেই একথা বলা, অমনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী, তাপস রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিমরা উঠে দাঁড়িয়ে না না করে ওঠেন। দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছিলেন পিছনের সারিতে। সুব্রত ও কল্যাণ চেয়ার ছেড়ে উঠে মমতার সামনে চলে আসেন। সুব্রতবাবু বলেন, মমতা যেও না, যেও না। এরকম সিদ্ধান্ত নিও না। কল্যাণের চোখ ছলছলে।

স্ক্রিপ্ট মেনে শেষমেশ রণে ভঙ্গ দেন তৃণমূলনেত্রী। তবে তার পরেই শুরু হয়ে যায় ভোটে হারজিতের ময়না তদন্ত। মন্ত্রী, নেতাদের বকাবকি, ধমকধামক। একে সরিয়ে ওকে মাথায় তোলা। কিন্তু দিদি নিজের দোষ খুঁজলেন না। একবারও ভাবলেন না তিনি নিজে গোটা দু'মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের মঞ্চে মঞ্চে মন্ত্রপাঠ করে আসলে ধর্মীয় মেরুকরণের কাজটাই করে গিয়েছেন।

ভোট বিপর্যয়ের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে অভিমান ঝরে পড়ল দিদির গলা থেকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যাঁ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''মানুষের জন্য অনেক করেছি। আর না। এবার দলে একটু বেশি সময় দেব।'' মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য যে শপথ নিতে হয় তাতে এই কথাটা বলা যায় না, অথচ তিনি বললেন। অবশ্য এই রাজ্যে তিনিই আইন, তিনিই সংবিধান। তাই তো তিনি বলতে পারেন ''বেশি করতে আবার একটু .... এখন মনে হচ্ছে একটু বেশিই করে ফেলেছি। এবার আমি একটু দল করব।'' সেই সঙ্গে দিদি এও বলেন, 'মানুষের প্রজেক্ট করতে গিয়ে যারা শুধু নিজেদের প্রজেক্ট



করেছে আমি তাদের জন্যও এবার একটু কড়া হব।'' মানে তিনি মেনে নিলেন। মানতে তো হবেই। তিনি যতই বলুন যে, এই নির্বাচনের ফল তিনি মানবেন না তবু মানতে তো হবেই। তেমনই এটা মানতে হবে যে, মানুষের প্রকল্পকে তৃণমূলের বানানোর জন্যই এই রায়। শুধু মেরুকরণ মেরুকরণ করে জনতার এই রায়কে ছোটো করে দেখা ঠিক হবে না।

লোকসভা ভোট হলেও, এবারের প্রচারে তৃণমূলের অন্যতম হাতিয়ার ছিল রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচি। দেওয়াল লেখা থেকে বক্তৃতা, সবেতেই জায়গা করে নিয়েছিল সবুজ সাথী,কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্প। তৃণমূল ভেবেছিল এগুলো দিয়েই বাজিমাত হবে। আর গ্রামাঞ্চলে এইসব প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া মানুষের সংখ্যা বিরাট। কিন্তু দেখা গিয়েছে গ্রামাঞ্চলেই তৃণমূলের ভোটে ধস নেমেছে। গ্রামীণ ১৫টি কেন্দ্র জিতে নিয়েছে বিজেপি। কিন্তু সেটা আদৌ শুধু ধর্মের জন্য নয়। মনে রাখতে হবে, সারা দেশেই মানুষ মোদী সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই রাজ্যের মানুষই বা তার থেকে বাদ যাবেন কেন?

অথচ দিদি বলছেন, এবার সরকার আর

মানুষের জন্য কাজ করবে না। সরকারি প্রকল্প নিয়ে এমন কথা বলার অধিকার আদৌ আছে কি তাঁর? অথচ আক্ষেপের সুরেই দিদি বলছেন, '' কী করিনি। মরে গেলেও এখন টাকা পায়। মানুষের জন্য সব করেছি। সব কমপ্লিট। এবার দলে সময় দেব।''

মেরুকরণ নয়, নীচু স্তরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাও যে জঙ্গলমহল-সহ একাধিক জায়গায় তৃণমূলের ধস নামিয়েছে সেই রিপোর্টও রয়েছে দিদির কাছে। তবু চুপ থেকে দিদি অন্যদিকে নজর ঘোরাচ্ছেন। কারণ দিদি জানেন, তাঁর নীচুতলার কর্মীরা যেভাবে জনগণের টাকা লুটপাট করেছে তা জনসমক্ষে বলা যায় না।

সামনে ইদ আসছে। তিনি অবশ্যই ইফতারে যাবেন। তাঁর কথায়, '' আমি তো মুসলমান তোষণ করি। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথও খাব।'' মমতার বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ কম নয়। বরং বহুদিনের। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেই ইমাম ভাতা চালু করেছিলেন মমতা। তখন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। তারপর ইদের দিন রেড রোডে গিয়ে নমাজ পড়া ইত্যাদি তোষণের রাজনীতির উদাহরণ অনেক। এমনকী সম্প্রতি পুলওয়ামায় সেনাবাহিনীর কনভয়ে সন্ত্রাসবাদী হানার পর মোদী সরকার যখন পাকিস্তানকে দায়ী করে, তখনও মমতা বলেছিলেন তদন্ত না করেই কেন দোষারোপ করা হচ্ছে। তাতেও স্পষ্ট হয়েছিল, সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে খুশি রাখতেই দিদি পাকিস্তানের পক্ষ নিতেও পিছপা হন না। ভাবুন তো, বাস্তবে যাই হয়ে থাক কোনও শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী কি এভাবে বলতে পারেন, ''যারা হিন্দু-মুসলমান করে ভোট দেননি, আমার ওপর সন্তুষ্ট হননি, তাঁদের কিছু বলার নেই। এতে যদি আমাকে একা থাকতে হয়, রাজি আছি। সারাজীবন লড়াই করেছি। আরও লড়াই করে যাব।''

তবে দিদি কিন্তু ভুল নন। ১৮টি আসনে তৃণমূলের পরাজয়ের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ হিন্দুপ্রধান এলাকাতেই ভরাডুবি হয়েছে দলের। বিপরীতে, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে দলের জয়ের ব্যবধান বেড়েছে। এমনকী বাম বা কংগ্রেসের হিন্দু ভোট বিজেপির দিকে গিয়েছে, তখন মুসলমান ভেটের মেরুকরণ হয়েছে তৃণমূলের অনুকূলে। যে ২২টি আসনে তৃণমূল জিতেছে তার প্রধান কারণ হলো মুসলমান ভোট। উলুবেড়িয়ায় সাজদা আহমেদ, জঙ্গিপুরে খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদে আবু তাহের, যাদবপুরে মিমি চক্রবর্তী, ডায়মন্ডহারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাটে নুসরত জাহান— এরা সকলেই জিতেছেন মুসলমান ভোটের তাকতেই। তাই তাঁদের প্রতি কৃজ্ঞতা স্বীকার করে নিলেন দিদি। যাতে ভবিষ্যতেও ষোলো আনা শক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে তারা তৃণমূলের পাশে থাকেন।

দিদি আপনিই ঠিক। কিন্তু আপনি যে গোরুর দুধ খান তাদের আর কতদিন গোরু বানিয়ে রাখতে চান। উন্নয়নের ডাকে সাড়া দিয়ে আর আপনার বঞ্চনার জবাব দিতে গিয়ে তারা দুধ দেওয়া যেদিন বন্ধ করবে সে দিনটার মুখোমুখি হতে পারবেন তো? ■

পশ্চিমবঙ্গের যেসব কেন্দ্রে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে

কেন্দ্র	বিজয়ী প্রার্থী	বিজপি প্রার্থী	জয়ের ব্যবধান
মালদহ দক্ষিণ	আবু হাসেন খান চৌধুরী (কংগ্রেস)	শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী	১১,৩৩৮
জঙ্গিপুর	খলিলুর রহমান (তৃণমূল কংগ্রেস)	মাফুজা খাতুন	২,৪৫,৭৮২
কৃষ্ণনগর	মহুয়া মৈত্র (তৃণমূল)	কল্যাণ চৌবে	৭৩,৫৩৭
আরামবাগ	অপরূপা পোদ্দার (তৃণমূল)	তপন রায়	২৭১১
শ্রীরামপুর	কল্যাণ ব্যানার্জি (তৃণমূল)	দেবজিৎ সরকার	৯৮,১৯২
হাওড়া	প্রসূন ব্যানার্জি (তৃণমূল)	রন্তিদেব সেনগুপ্ত	৯৫,৮৩১
উলুবেড়িয়া	সাজদা আহমেদ (তৃণমূল)	জয় ব্যানার্জি	২,১৫,৩৫৯
বারাসত	কাকলী ঘোষ দস্তিদার (তৃণমূল)	ডাঃমৃণালকান্তি দেবনাথ	১,১০,৬৩৮
দমদম	সৌগত রায় (তৃণমূল)	শমীক ভট্টাচার্য	৫৩,০০২
যাদবপুর	মিমি চক্রবর্তী (তৃণমূল)	অনুপম হাজরা	২,৯৫,২৩৯
ডায়মন্ডহারবার	অভিষেক ব্যানার্জি (তৃণমূল)	নীলাঞ্জন রায়	৩,২০,৬৭৮
মথুরাপুর	চৌধুরী মোহন জাটুয়া (তৃণমূল)	শ্যামাপ্রসাদ হালদার	১,৯৯,৫৫৬
জয়নগর	প্রতিমা মণ্ডল (তৃণমূল)	ডাঃ অশোক কাণ্ডারি	৩,১৬৮৯৪
বসিরহাট	নুসরত জাহান (তৃণমূল)	সায়ন্তন বসু	২,৮২,০৯৯
ঘাটাল	দীপক অধিকারী (তৃণমূল)	ভারতী ঘোষ	১,০৮,৯৭৩
কাঁথি	শিশির অধিকারী (তৃণমূল)	ডাঃ দেবাশিস সামন্ত	১,১২,৪৫৮
তমলুক	দিব্যেন্দু অধিকারী (তৃণমূল)	সিদ্ধার্থশংকর নস্কর	১,৯০,৩১৫
বীরভূম	শতাব্দী রায় (তৃণমূল)	দুধকুমার মণ্ডল	৮১,৪০২
বোলপুর	অসিত কুমার মাল (তৃণমূল)	রামপ্রসাদ দাস	৯৪,১৯০
কলকাতা (উ:)	সুদীপ ব্যানার্জি (তৃণমূল)	রাহুল সিনহা	১,২৫,৮৯৭
কলকাতা (দ:)	মালা রায় (তৃণমূল)	চন্দ্রকুমার বসু	১,৫৫,১৯২
বর্ধমান পূর্ব	সুনীল কুমার মণ্ডল (তৃণমূল)	পরেশচন্দ্র দাস	১,১৪,৩৭৯

হিন্দুত্বের জাগরণ সন্ত্রাসী শক্তিকে রুখে দিয়েছে

সরোজ চক্রবর্তী

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সন্ত্রাস ও হামলা চালানো হয়েছে তা পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে কি কাম্য? এই প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব নির্বাচনেই গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে। লোকসভা থেকে বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভা-সহ স্কুল-কলেজের নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পদদলিত। আসলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে দুবৃর্ত্তায়ন ঘটেছে। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে জনগণকে শান্তি ও স্বস্তি দেওয়ার পবিবর্তে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা চলে আসছে বহুদিন থেকে। কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে চরম আকার নিয়েছে। এই বাঙ্গলায় এখন গণতন্ত্রের নরকযাত্রা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে এবারের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে আসা বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক অজয় নায়েকের বক্তব্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি দশ বছর আগের অশান্ত বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে ভোটকর্মীরা যে কতটা আতঙ্কিত তা তাদের কথাতেই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া নির্বাচনের কাজে যেতে সরকারি চাকুরিজীবীরা ভয় পেয়েছেন। এজন্য বুথে সক্রিয় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়নের জন্য ভোটকর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ২০১৬ সালে রায়গঞ্জে ভোটকর্মী রাজকুমার রায়ের পরিণতি এখনও তাঁরা ভোলেননি। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বুথে বুথে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করেছিল, যাদের চাকরি দেওয়া হয় তৃণমূলের আমলে এবং তৃণমূলের ক্যাডার হওয়াই ছিল যাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। তাদের নিরাপত্তায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। ফলে তৃণমূলের জল্লাদ ও হার্মাদবাহিনী অবাধে ভোট জালিয়াতি করেছিল। প্রায় অর্ধেক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং বাকিগুলিতে জনগণকে সার্বিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না দিয়ে জিতে গিয়েছিল তৃণমূল।

রাজ্য রাজনীতি

> **দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও নীতি আদর্শ মেনে চলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবেই দেশে সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বাস্তবায়িত হতে পারবে। হিন্দুত্বের এই জাগরণের পথ ধরেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।**

২০১৬ সালে নির্বাচনের আগে কমরেডদের কায়দায় বিরোধী প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া, ব্যালট বাক্স লুট, নির্বাচনে জেতা প্রার্থীদের এলাকা ছাড়া করা প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে থাকে রাজ্য জুড়ে। বিরোধী প্রার্থীদের বিশেষ করে মহিলা প্রার্থীদের অত্যাচারের ঘটনা সমস্ত রকম মানবিকতাকে লজ্জা দিয়েছে। রাজ্যের বহু জায়গায় বিরোধী প্রার্থীদের ভয় বা লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনেছে শাসকদল। এমনকী জেতা প্রার্থীরাও এর থেকে রেহাই পায়নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সহ বিভিন্ন বিরোধী দলকে নানা অজুহাতে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর অনুমতি দিলেও শাসকদলের নির্দেশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হেলিকপ্টার নামার অনুমতি দেয়নি রাজ্য প্রশাসন। শাসকদল বিরোধীদের বহু সভা বানচালের কৌশল করেছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে। কুৎসিত ভাষায় বিরোধী নেতা-নেত্রীদের আক্রমণ, সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ ও কুমন্তব্য করার ট্রাডিশন চালু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা। এখন এটাই যেন পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাদের গুণ্ডাবাহিনীকে জলপাই রংয়ের পোশাক পরিয়ে বুথে বুথে পাঠানোর কৌশল করে বলে অভিযোগ ওঠে। এই পোশাকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও জওয়ানদের পোশাকের সাদৃশ্য থাকায় সাধারণ ভোটাররা তাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী বলে ভুল করবে। এর ফলে তৃণমূলের ওই গুন্ডাবাহিনী এলাকায় ছাপ্পা ভোট করানোয় সফল হবে। ভোটে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে তৃণমূল তাদের

জল্লাদবাহিনীকে ওই ধরনের পোশাক পরিয়ে ক্যামোফ্লেজ করতে চেয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের দাপটে বিফল হয়েছে কমিশনের মেশিনারি। সব মিলিয়ে জঙ্গল রাজে পরিণত পশ্চিমবঙ্গ। ব্যারাকপুর, হুগলি, ঘাটাল, কেশপুর, মেদিনীপুর, আরামবাগ, বনগাঁ, ধনেখালি, বীরভূম সহ বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলের বুথ এজেন্টের বাড়িতে ভাঙচুর, বিজেপিকর্মীর বাড়ির সামনে বোমাবাজি, বিজেপির এজেন্টকে মারধর ও হামলা করার অভিযোগ ওঠে। এই লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি জেলাতেই হয়েছে অশান্তি, হামলা, সন্ত্রাস ও বোমাবাজি। শুধু ভোটের দিনই নয়, ভোটের পরও জারি থেকেছে হিংসা।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল এবং ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে যে ছবি ফুটে উঠল— তা কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য নয়। তবুও হয়েছে। বামেরা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করত ঠিকই কিন্তু এতটা বেআব্রু দলদাস প্রশাসন তখন ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১০০ কোটি মানুষ এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। কোথাও নির্বাচন ঘিরে বাঙ্গলার মতো এমন অশান্তির খবর আসেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রথমদফা থেকে সপ্তম দফা পর্যন্ত প্রতিটিতেই অশান্তি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কঠোর অবস্থানের পরেও চিত্রটা বদলায়নি।

রাজনীতি থেকে অনেক আগেই সভ্যতা, ভদ্রতা নম্রতা, সততা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ও শালীনতাবোধ উধাও হয়ে গিয়েছে। রাজনীতিকরা সচেতনভাবেই তা বিসর্জন দিয়েছেন। গণতন্ত্র তাই আজ ক্রমশ পিছু হটছে। কিন্তু তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। যেন এমনটাই চান এই রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। বাঙ্গলার জনগণও অনেকটা 'সহনশীল' হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বাঙ্গলার রাজনৈতিক নেতাদের শিষ্টাচারহীনতা।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ড আর শক্ত নেই। আজকে প্রতিবাদী চরিত্রের খুব প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী আর সরকারের মধ্যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্যের খেলা চলছে। এখন গণতন্ত্র প্রহসনে হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে মাটিতে। এখনকার কিছু বুদ্ধিজীবী যেন— 'Neither right nor left, but upright' হয়ে পড়েছে। এই 'upright' থাকা একটি 'ইউটোপিয়ান' ধারণা। এটিও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করছেন। এখান থেকে বেরুতেই হবে। এজন্য প্রতিবাদ দরকার। সততার জন্য, আদর্শের জন্য লড়াইয়ে নামতে হবে জনসাধারণকেই।

প্রথম দফা থেকে শেষ দফা পর্যন্ত রাজ্যের ভোটের দিনে অশান্তির ঘটনার পাশাপাশি ক্ষীণ আলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ মানুষ শাসকদলের সন্ত্রাস ও হামলাকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন। এর ফলে নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। সাধারণ মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সরব হন তাহলে বাঙ্গলার হৃতগৌরব আবার ফিরে আসবে— এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ব পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একটা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। হিন্দুত্বের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়ার এক সার্থক সমন্বয় দেখা যায়। এই ধর্মের একটা সামাজিক প্রকাশ আছে। ধর্ম ব্যক্তি নির্ভর বিষয় নয়, ধর্ম হলো সামাজিক বিষয়। ধর্মের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ধর্মবোধের মননশীল ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। কারণ ধর্মের ধারণার মধ্যে বিভিন্ন সদুপদেশ ও মননশীল পর্যায় রয়েছে। সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে ধর্ম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সূত্রে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশের প্রভাবে মানুষের আচার ব্যবহার স্বভাবতই সংযত হয়ে পড়ে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে গ্রামবাংলার মানুষ সেই ধর্মীয় বাতাবরণেই শান্তি খুঁজতে চেয়েছেন, সমাজের নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে ইভিএমে। যেহেতু বিজেপি এই ধর্মীয় বাতাবরণে দেশবাসীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের উপরই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জনগণ ভরসা রেখেছেন। এই রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার দেখা গিয়েছে। ভারতবর্ষের জনগণ একটা আদর্শবান মজবুত সরকার চেয়েছিল, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিপুলভাবে মোদীজীর পক্ষে দেশবাসী রায় দিয়েছে। এই জয়ের পর নরেন্দ্র মোদীজী বলেন, 'দেশের মানুষ ভারতের জন্য ভোট করেছেন। দেশের নাগরিকদের ভাবনা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করছে। এই ভোট কোনও দল লড়েনি। লড়েছে ভারতের জনতা। এই জয় ভারতের জনতাকে সমর্পণ করলাম। কোটি কোটি দেশবাসী আমার মতো ফকিরের ঝোলা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমি ১৩০ কোটি জনতাকে প্রণাম জানাই। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে আজকের জয়ই সবথেকে বড়ো সাফল্য।

মহাভারতের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি কারও পক্ষে নয়, হস্তিনাপুরের উন্নতির পক্ষে ছিলাম। আজ ২০১৯ সালেও ভারতের ১৩০ কোটি মানুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপেই ভারতের উন্নয়নের পক্ষে ছিলেন।

তাই আজ বিজয়ী হয়েছে ভারত। বিজয়ী হয়েছে জনতাজনার্দন।' বিপুল জয়ের পর এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিলেন নরেন্দ্র মোদী। বললেন, আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি, আমি নিজের জন্য কিছুই করব না। আমার প্রতিটি মুহূর্তই হবে দেশবাসীর জন্য'— এ ধরনের ভাবনা একজন সৎ আদর্শবান ধার্মিকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও নীতি আদর্শ মেনে চলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবেই দেশে সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বাস্তবায়িত হতে পারবে। হিন্দুত্বের এই জাগরণের পথ ধরেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। ■

সোনিয়া গান্ধীর নাগরিকত্ব

গত ৩ মে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশ, ২০০৩ সালে ব্রিটেনে নথিভুক্ত একটি সংস্থা ব্যাকপস্ লিমিটেডের পরপর দু'বছরে দাখিল করা বার্ষিক রিটার্নে ওই সংস্থার একজন ডিরেক্টর হিসেবে রাহুল গান্ধীর নাম রয়েছে; সেখানে রাহুলকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী প্রমাণ-সহ বিষয়টি জানালেও কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশন কোনও পদক্ষেপ করেনি। ওই নিয়ে সম্প্রতি দুই ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। আমরা এখন রাহুলজীর বক্তব্য জানার অপেক্ষায়। এ প্রসঙ্গে রাহুল-জননী সোনিয়া গান্ধীর ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের ব্যাপারটা স্মরণ করা যেতে পারে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানচালক রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 'ইতালিয়ান' সোনিয়া মাইনো-র বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। বিয়ের পর দেড় দশক তিনি তাঁর ইতালীয় নাগরিকত্ব ধরে রেখেছিলেন। ১৯৮০ সালে বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হলে রাজীব গান্ধীকে কংগ্রেসি রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়; এবং ১৯৮১ সালে তিনি লোকসভার উপনির্বাচনে আমেথি কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার দু'বছর পর, ১৯৮৩ সালে রাজীব-পত্নী সোনিয়া ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন এবং ভারতীয় নাগরিক হন। ঘটনাচক্রে রাজীবকে রাজনীতিতে যোগ দিতে না হলে সোনিয়াজী যে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করতেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য, তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন তারও প্রায় দেড় দশক পরে, ১৯৯৭ সালে। গান্ধী-পরিবারের বধূ হয়ে ১০নং জনপথে প্রবেশ করার তিন দশক পরে সোনিয়াজীর কংগ্রেস-সদস্যপদ গ্রহণের পিছনে দেশ ও দশের স্বার্থ বা তাঁর নিজের স্বার্থ কাজ করেছে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকবে। তিনি তাঁর ইতালীয় নাগরিকত্ব আদৌ ত্যাগ করেছেন কিনা, সে বিষয়েও ধোঁয়াশা বিদ্যমান।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

জেলাশাসক করণের স্থাপত্য বিভাগকে স্বচ্ছ করার আবেদন

''এই তো জীবন হিংসা বিবাদ লোভ ক্ষোভ বিদ্বেষ/চিতাতেই সব শেষ''—জনপ্রিয় গানের কলিটি মাঝে মাঝে স্মরণ করি। বিষয়টি হলো কোচবিহার জেলা শাসকের কর্মচারী থেকে বিরোধী সংগঠনের কর্মচারীরা বোধহয় হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কারণ, কোনো কর্মচারী তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে বলতে গেলে তারা জেলাশাসকের অসহযোগিতা করছেন বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। আবার দেখা করবো বললে তখন বলেন, উনি কাউকে ওনার চেম্বারে ঢুকতে অনুমতি দেন না। এই ভাবে সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে জেলাশাসক সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা তৈরি করে দিয়েছে। কারণ, জেলাশাসক জানেন না সমস্ত কর্মচারীর কাছে উনি ত্রাস। উল্লেখ্য, স্থাপত্য বিভাগের কিছু কর্মচারী নিজের সুবিধাটুকু কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নিতে সদা তৎপর। কারণে অকারণে নিজেদের সহকর্মীদের দূরদূরান্তে বদলি করতেও পিছপা হন না। তাই, মাননীয় জেলাশাসকের কাছে বিশেষ অনুরোধ বিষয়টি দেখুন। বর্তমান সময়ে স্থাপত্য বিভাগটি রাজনীতির আখড়া ও ঘুঘুর বাসা বলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এই শব্দ দুটি আপনার সময়কালে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। বামেদের ডাকা গত ভারত বনধে আপনার অফিসের হাজিরা একমাত্র আপনি দেখবেন এটাই কাম্য, কিন্তু দেখা যায় আপনার সঙ্গে তৃণমূলের নেতা প্রত্যেক সেকশনে ঘুরে কর্মচারীদের হুমকি দিচ্ছেন, এটা কি সঠিক? প্রসঙ্গত, জেলা ও মহকুমার সমস্ত কর্মচারীর আপনি অভিভাবক সেইজন্য সকলের প্রতি আপনার সমান দৃষ্টি



থাকবে এটাই সকল কর্মচারী কামনা করে।

অতএব, করজোড়ে মিনতি স্থাপত্য বিভাগটি থেকে রাজনীতি তুলে দিয়ে একটা স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দিন।

—ফাল্গুনী চক্রবর্তী,
নিউটাউন, কোচবিহার।

ভারত নববলে বলীয়ান হয়ে উঠছে

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সমগ্র বিশ্বে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে যার প্রভাব সরাসরি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পড়তে চলেছে। একদিকে যেমন আমেরিকা-ইরান সংঘাত সমগ্র বিশ্বকে আরেকবার মধ্য প্রাচ্যের আকাশে ঘনীভূত যুদ্ধের কালো মেঘের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, অন্য দিক চীন-আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধ নতুন মাত্রা পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাকে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক করে উন্নত দেশগুলি গাজোয়ারি একতরফা আমদানি শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যকে অস্তিত্ব সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইসলামিক স্টেট নামক ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের হাত থেকে শ্রীলঙ্কার মতো নিরীহ, শান্তিপ্রিয় দেশও আজ রেহায় পাচ্ছে না। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপোশহীন জাতীয়তাবোধই একমাত্র পারে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষিত করতে।

জাতিগত, আঞ্চলিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোত থেকে অপ্রাসঙ্গিক করে জাতীয় ঐক্যের পথকে সুগম করতে হবে। একদিকে যেমন প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিন্তিত করে তাদের

বিতাড়িত করতে হবে তেমনি কাশ্মীরে ধারা ৩৭০ বিলোপ করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বজায় রাখার তাগিদে যে সমস্ত আঞ্চলিক শক্তি যে কোনও রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রাজ্যকে তাদের নিজ নিজ আন্তর্জাতিক সীমানা সুরক্ষার বিষয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর মেনে চলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশ রোখার ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত এস ও পি মেনে বিএসএফকে সমস্ত সহযোগিতা করতে হবে। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা নিজেদের গদি বাঁচাবার তাড়নায় ভয়ংকর আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে, কোথাও রাজ্যের নিজস্ব পতাকা ব্যবহার শুরু হয়েছে, কোথাও রাজ্যের মধ্যে তৈরি হওয়া রোজগারের একটা বড়ো অংশকে সেই রাজ্যের যুবকদের জন্য সংরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগপতিদের বাধ্য করছে। এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলকে ছিনিমিনি করতে দেওয়া যাবে না।

স্বাধীনতার পর প্রথম বার দেশের সামরিক খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় তিন লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি জনগণ ও দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে উদ্বেলিত জাতীয়তাবোধের ঢেউ আজ একই তীব্রতায় দেশের প্রতিটি কোনায় আছড়ে পড়ছে। আজ আমাদের সেনাবাহিনী ভারতমাতার প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করতে সক্ষম এবং যারা ভারতমাতার দিকে কু-নজর দেবে তাদের চোখ উপড়ে নেবে, তারা সীমানার এপারেই থাক বা ওপারে।

জিএসটি এবং নোটবন্দির জেরে আর্থিক জাতীয়তাবোধের যে সোপান রচিত হয়েছে তাকে নিশ্চিতরূপে আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে দেশের প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি সম্পদ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে। কালো অর্থনীতিকে অঙ্কুরে বিনাশ করে দেশের সীমানার মধ্যে থাকা প্রতিটি পুঁজি রাষ্ট্রের উন্নয়নের কাজে লাগানোর ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে হবে।

দেশকে সামরিক প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি, কৃষি প্রযুক্তিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মেক ইন ইন্ডিয়া আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং এদেশের যুব সম্প্রদায় এই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে গোটা বিশ্বে নজির স্থাপন করবে। একবিংশ শতাব্দীর ভারত হোক নব জাতীয়তাবোধের ভারত, ঐক্যের ভারত, অটুট ভারত। এই নব জাতীয়তাবোধের বলে বলীয়ান হয়ে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে মহাশক্তিশালী হয়ে উঠুক।

—সোমনাথ গোস্বামী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী একটি সুন্দর উদাহরণের অবতারণা করেছেন। 'নাচতে না জানলে সবাই উঠোনের দোষটাই বারে বারে দেখে'। কারণ জনগণকে তো বুঝতে হবে ইভিএম ঠিক থাকলে আমরা হারার পাত্র নই। সব দোষই ইভিএমে। যারা সত্যিকারের গণতন্ত্র মানে তারা কখনওই এই ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনকে অযথা দায়ী করবে না। যদি এক্সিটপোলে বিজেপিকে হারার কথা শুনাতো তাহলে অনেক নেতা-নেত্রীই বলতো ইভিএম মেশিন সত্যিই যুগকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এটা না থাকলে এতো চটজলদি কোনো কিছুই সম্ভব হতো না। গোল বেঁধেছে এক্সিটপোলের সমীক্ষা বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে। একটা কথা শুধু আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতিই নন বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাই ভাবছে— বিজেপি জিতলে ইভিএম খারাপ হয় আর বিরোধীরা জিতলে ইভিএম নির্ভেজাল। এর আগেও অনেক নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিজেপি গোহারা হেরেছে তখন সবাই যেন বোবা স্কুলের ছাত্র হয়ে গেছে। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একজন তুখোড় রাজনীতিবিদ তার ক্ষুরধার দৃষ্টিতে সবটাই বুমেরাং হয়ে গেছে। তিনিও বিস্মিত হয়েছেন জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ইভিএমের দোষ দেওয়া নিছকই ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে আরও বলেছেন 'জনগণের রায়কে গুরুত্ব দেওয়াই প্রকৃত গণতন্ত্র।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

গড্‌সে ও গান্ধীজী

দেশভাগের বলি, যাদের মা-বোনরা ইসলাম বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে, যারা জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যাদের মা-বাবা-ভাই- বোনরা খুন হয়েছে, তাদের চোখে গান্ধীজী নয়, গড্‌সে হলো গড এবং দেশপ্রেমিক। গড্‌সের শাস্তিদানকারী বিচারপতিও তার প্রশংসা করেছেন। এমনকী কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক তাকে মহাপাতক বললেও দেশপ্রেমিক বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই মহাসত্য কথাটি প্রজ্ঞা ঠাকুর সেভাবে ব্যক্ত করতে পারেনি, তাই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ও রাজনীতিবিদদের চোখে অপরাধী হয়েছেন।

তবে এখন এক প্রশ্ন থেকে গেছে। গড্‌সের গুলিতেই কি গান্ধীজী নিহত হয়েছেন, না অন্য এক ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতার পরও তিন দশক বেঁচেছিলেন বলে অনেকে বলেন।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা



প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে মহিলাদের

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আজকের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমাদের অতি ভোগবাদী জীবনযাত্রাই আমাদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের অন্তহীন চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে সীমিত ভাবে করতাম তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না। এর দুষ্পরিণাম আজ আমাদের সামনে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিপদের সম্মুখীন হতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। জন টেন্ডন ১৮৫০ সালে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি পৃথিবীকে ভীষণ ঠাণ্ডা বা গরম করে দেবে। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা আইসোটোপ গবেষণা করে জানিয়েছিলেন যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হলো জীবাশ্ম ইন্ধনের ব্যবহার।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষ দায়ী। বর্তমানে পৃথিবীতে গ্রিন হাউস গ্যাস নিষ্কাষণের বড়ো কারণ যাতায়াত। এখন পৃথিবীতে ২শো ৩৫ কোটি গাড়ি রাস্তায় চলে এবং ২০৩৫ সালে এর আনুমানিক সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে ৩শো কোটি। ভারতের অবস্থাও ওই দিকে চলেছে। এখানে ২০০১ সালে গাড়ির সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ; আর ২০১৫ সালে তা বেড়ে ২১ কোটি ২৪ হাজারে পৌঁছে গেছে। বর্তমান স্থিতি এমন যে, রাস্তা দেখা যায় না, শুধু গাড়ি আর গাড়ি! প্রতিদিন পথেঘাটে জ্যাম লেগেই থাকে— যা কার্বন নিষ্কাষণ বাড়িয়ে চলেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প বিপ্লব দীর্ঘসময় ধরে প্রদূষণ স্তর বাড়াবার একটি অন্যতম মুখ্য কারণ। সমগ্র বিশ্বে যখন দূষণ একটি বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছায়, তখন কার্বন-উৎসর্জন কম করার জন্য প্রদূষণকারী দেশগুলি কিছু পদক্ষেপ নেয়। ফলস্বরূপ, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ২০০০ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে নিজ নিজ কার্বন নির্গমন যথাক্রমে ১৫ এবং ২৯ শতাংশ কম করে ফেলেছে।

এইরকম, গোটা পৃথিবীতে বন-জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র গাছপালা কার্বন সৃষ্টির বিপদ কম করতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, আমাদের অপরিসীম লোভের জন্য আমরা জঙ্গল কেটে চলেছি। কেবলমাত্র ২০১৭ সালে ৩৯০ লক্ষ একর জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে একটি গাছ কাটা হয়েছে। এছাড়া ২১ শতাংশ বন দাবানলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মাংস ও মাংস উৎপাদন, যা গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎসর্জনের একটি মুখ্য কারণ। আজকের তুলনায় ২০৩০ সালে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে— ফলে আগামীদিনে মানুষের মধ্যে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাবে। হিসেব মতো, ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৯.৫ মিলিয়ন লোক এর শিকার হবে। এছাড়া স্মার্টফোন, নির্মাণকার্য এবং কম্পিউটার ডাটা, যা আজ কেবল এক শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎসর্জনের জন্য দায়ী, তা ২০৪০ পর্যন্ত ১৪ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাস উৎসর্জন করবে, কারণ আমরা ভোগবাদী সভ্যতার অংশীদারে পরিণত হয়েছি।

বর্তমান পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরাই দায়ী, সুতরাং এর সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্বও আমাদের। আধুনিক জীবনযাত্রার আজ আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেগুলি পরিত্যাগ করা অত সহজ নয়, কিন্তু বাহুল্য কম করতে পারি। আমাদের সংযমপূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত ব্যবহার আমাদের সুস্থ-দীর্ঘ জীবন দেবে এবং পৃথিবীকেও সবুজ, প্রাণবন্ত রাখবে। প্রকৃতির প্রতি মহিলারা খুবই সংবেদনশীল। সেজন্য মহিলারা প্রকৃতি এবং পরিবেশ রক্ষার মুখ্য ভূমিকা নিতে পারেন। আমাদের অনাবশ্যক ভোগ বিলাসিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবার, সমাজ এবং দেশকে সঠিক পথ দেখাতে পারে মহিলারা। এতে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা হ্রাস পাবে।





জিরা ও জোয়ান ঔষধীয় গুণসম্পন্ন মশলা

অসিতবরণ আইচ

জিরা

● জিরা সবাই চিনি, সবাই খাই, কিন্তু ঔষধীয় গুণ জানা নেই। রান্নায় দেওয়া হয়, দিলে খেতে ভালো লাগে। খাদ্যকে সুগন্ধিত ও সুস্বাদু করে।

● প্রচুর আয়রনযুক্ত জিরা। রক্তে লোহার পরিমাণ বাড়ায়। সুতরাং রোগ প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ে।

● জিরা ভেজানো জলে নানা উপকার সাধিত হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় এক গ্লাস জলে ১ চামচ জিরা ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে পান করতে হয়।

● হজম করাতে জিরা অদ্বিতীয়। অ্যাসিডিটি কমায়। মেদ ঝরায়। ওজন কমায়। কারণ, জিরা খাইখাই ভাবটা কমায়।

● এক কাপ টক দইয়ে ২ চিমটি জিরার গুঁড়ো ভাতের সঙ্গে খেলে স্বরভঙ্গ ভালো হয়।

● জিরা অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর গরম করে জলটা অর্ধেক করে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খেতে হবে। ভালো ঘুম হবে রাতে শোবার আগে খেলে।

● জিরা-চা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, সকাল-বিকাল দু'বেলা খেতে হবে। সকালে কাজে-কর্মে জোর না-পাওয়া দূর করে। স্মৃতিশক্তি বাড়ে জিরা চা খেলে।

● রক্তের বিষ দূর করে। বমি বমি ভাব দূর করে। পাকস্থলী ও যকৃত পরিষ্কার করে জিরাজল।

● জিরা জল অস্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরল কমায়।

● গোটা জিরা চিবিয়ে খেলে মুখ থেকে প্রচুর লালা নিঃসরণ হয়। ফলে খাদ্য ভালো হজম হয় এবং অ্যাসিডিটি কমায়।

● অন্ত্রের ভাইরাস নষ্ট করে। জিরে থেতো করে জলে ভিজিয়ে গরম করে অর্ধেক হলে সেই জল খেলে অর্শরোগে আরাম মেলে।

● জিরা ভেজানো জল ভালো করে ফুটিয়ে খেলে কৃমি কমে। কিডনির পাথর গলিয়ে দেয়।

● ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি বন্ধ করে জিরা। হৃদ্‌স্পন্দন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

● হাঁপানি দূর করতে সাহায্য করে।

● বোলতা-ভীমরুল-বিছার জন্য যন্ত্রণার স্থানে জিরাবাটা লাগালে উপশম হয়।

জোয়ান

● হোটেল-রেঁস্তোরার-কাউন্টারে খাওয়া ছাড়া অনেকে আর কখনো জোয়ান খায়নি।

● অথচ জোয়ান ছোটোখাটো এক ডাক্তার। রান্নাঘরে তার চেম্বার।

● জোয়ান কাঁচা খাওয়া যায়। ভেজে খাওয়া যায়, আবার কাঁচা বেটে বা ভাজা খাওয়া যায়।

● রান্নায় জোয়ানের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ দুপুরের ভোজনের রান্নায় অবশ্যই জোয়ান বাটা দিতে হয়। তাহলে পিত্ত শান্ত থাকে।

● কাঁচা জোয়ান বাটা জলে গুলে খেলে পেট ফাঁপা কমে, মূত্ররোধ, মূর্ছারোগে লাভ হয়।

● জোয়ান অ্যান্টিসেপটিক। কাঁচা জোয়ান বাটা বা গুঁড়ো যে কোনো ক্ষতে দিলে পচন ধরে না কোনো কীট জন্মাবে না।

● এক গ্লাস গরম জলে এক চামচ জোয়ান, বিট নুন দিয়ে সেদ্ধ করে সেই জল খেলে বদহজম গ্যাস ধারে কাছে আসবে না।

● জোয়ানের তেল বা জোয়ান বাটার প্রলেপ রক্তপড়া দাঁতের গোড়ায় দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে।

● অর্শরোগে রক্তপড়া বন্ধ হবে ১/২ গ্রাম করে ভাজা জোয়ান ও ভাজা কালোজিরা চূর্ণ দু'বেলা জলসহ খেলে।

● গর্ভাবস্থায় জোয়ান না খাওয়াই ভালো।

● বমি ও পায়খানা একসঙ্গে হচ্ছে ১/২ চা চামচ জোয়ান বাটা খুব ঠাণ্ডা জলে গুলে ছেঁকে দিনে ৩-৪ বার খেতে হবে।

● সর্দি-কাশি-কফ কমাতে সুতির ন্যাকড়ায় জোয়ান দিয়ে পুঁটলি বানিয়ে নাকে ঘ্রাণ নিতে হবে। এতে হাঁপানিতেও কাজ হয়।

● ঋতু সংক্রান্ত অনিয়ম মহিলাদের বিড়ম্বনায় ফেলে। জোয়ানবাটা জলে গুলে ছেঁকে খেলে লাভ হবে। সব অনিয়ম দূর হবে।

● জোয়ানের গুঁড়ো লস্যি বা ঘোলে মিশিয়ে খেলে পিত্ত নিয়ন্ত্রিত থাকে। তবে রাত্রে নয়।

● জোয়ান ও দারচিনি ৩-৩ গ্রাম গুঁড়ো একসঙ্গে খেলে জ্বর কমে। দিনে তিনবার খেতে হবে।

● রাত্রের রান্নায় জোয়ানবাটা খাওয়া নিষেধ।

● রাতে খাওয়ার পর জোয়ান বাটার জল খেলে ভালো ঘুম হওয়ার কথা।

● খাদ্য বিষক্রিয়ায় বমি হলে, হালকা ভাজা জোয়ান গুঁড়ো জলে গুলে খাওয়ালে বমি বন্ধ হবে।

● রুটি-পরোটা-লুচি হজমে মৌরি ভালো। ভাত পোলাও হজমে জোয়ান ভালো। ■

হার্মাদ রাজনীতির গালে গণতন্ত্রের থাপ্পড়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ। আর বিজেপি বলেছিল, ঊনিশে হাফ একুশে সাফ। অক্ষরে অক্ষরে না হলেও এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাদের কথা রাখল। পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি লোকসভা আসন জয় করে তারা বুঝিয়ে দিল, এ রাজ্য আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরামকেদারা নয়। গুন্ডামি আর সন্ত্রাসের যে বিভীষিকা তিনি পশ্চিমবঙ্গে কায়েম করেছেন তার জবাব দেবার জন্য মানুষ তৈরি। তাদের বিশ্বাস, বিজেপি হলো সেই শক্তি যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে। এই বিশ্বাসের প্রতিফলন আমরা প্রথমে দেখেছিলাম পঞ্চায়েত



নির্বাচনে। সেবার তৃণমূল ৩৪ শতাংশ আসনে ভোট করাতেই দেননি। ভোট দিতে পারেননি সাধারণ মানুষ। সেই ক্ষোভ তাদের মনে ছিল। এবারের লোকসভা নির্বাচনে সুদে আসলে তারা তা মিটিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে অধুনা প্রচলিত অশালীন এবং অসভ্য রাজনীতির গালে গণতন্ত্রের থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা তাদের পছন্দের বিকল্প পেয়ে গেছেন।

তৃণমূল যদি আত্মসংশোধনের পথে না যায় তা হলে তাদের শেষের সেদিন খুব দূরে নয়। নির্বাচনে যারা জিতেছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের গৈরিক অভিনন্দন।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ী প্রার্থীর নির্বাচনী ফলাফল

কেন্দ্র	বিজয়ী প্রার্থী	বিজয়ী দল	জয়ের ব্যবধান	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী
আলিপুরদুয়ার	জন বার্লা	বিজেপি	২৩৮৭২৯	দশরথ তিরকে (তৃণমূল কংগ্রেস)
কোচবিহার	নিশীথ প্রামাণিক	বিজেপি	৫১০৫৯	পরেশচন্দ্র অধিকারী (তৃণমূল কংগ্রেস)
জলপাইগুড়ি	জয়ন্ত কুমার রায়	বিজেপি	১৭৬০৮৮	বিজয় চন্দ্র বর্মণ (তৃণমূল কংগ্রেস)
দার্জিলিং	রাজু বিস্তা	বিজেপি	৩৬২৭৯৩	অমর সি রাই (তৃণমূল কংগ্রেস)
রায়গঞ্জ	দেবশ্রী চৌধুরী	বিজেপি	৬০৬৮৬	কানাইলাল আগরওয়াল (তৃণমূল কংগ্রেস)
বালুরঘাট	ড. সুকান্ত মজুমদার	বিজেপি	৩৩৫৫৫	অর্পিতা ঘোষ (তৃণমূল কংগ্রেস)
মালদহ উত্তর	খগেন মুর্মু	বিজেপি	৮৩২৮১	মৌসম নুর (কংগ্রেস)
রাণাঘাট	জগন্নাথ সরকার	বিজেপি	২৩০৮৮৩	রূপালী বিশ্বাস (তৃণমূল কংগ্রেস)
হুগলি	লকেট চ্যাটার্জি	বিজেপি	৭৩৩৬২	ড. রত্না দে নাগ (তৃণমূল কংগ্রেস)
বনগাঁ	শান্তনু ঠাকুর	বিজেপি	১০৯৮৫৫	মমতা বালা ঠাকুর (তৃণমূল কংগ্রেস)
ব্যারাকপুর	অর্জুন সিংহ	বিজেপি	১৩১৯০	দীনেশ ত্রিবেদী (তৃণমূল কংগ্রেস)
বাঁকুড়া	ডাঃ সুভাষ সরকার	বিজেপি	১৭৪৩৩৩	সুব্রত মুখার্জি (তৃণমূল কংগ্রেস)
বিষ্ণুপুর	সৌমিত্র খান	বিজেপি	৭৮০৪৭	শ্যামল সাঁতরা (তৃণমূল কংগ্রেস)
পুরুলিয়া	জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাত	বিজেপি	১৯৫২৪৮	ড. মৃগাঙ্ক মাহাত (তৃণমূল কংগ্রেস)
মেদিনীপুর	দিলীপ ঘোষ	বিজেপি	৮৭১৩৩	ডাঃ মানস রঞ্জন ভুইয়া (তৃণমূল কংগ্রেস)
ঝাড়গ্রাম	কুনার হেমব্রম	বিজেপি	৯৬৬৬	বীরবাহা সোরেণ (তৃণমূল কংগ্রেস)
বর্ধমান-দুর্গাপুর	এস এস আহলুওয়ালিয়া	বিজেপি	২৪৩৯	ড. মমতাজ সংঘমিতা (তৃণমূল কংগ্রেস)
আসানসোল	বাবুল সুপ্রিয়	বিজেপি	১৯৭৬৩৭	মুনমুন সেন (তৃণমূল কংগ্রেস)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ



বাংলা জুড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রা। (ফাইল চিত্র)

স্বাধীনতার পর রাজ্যে প্রথমবার কাজ করলো 'হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক'

অভিমন্যু গুহ

ভোটের ফলঘোষণার দিন সকালে একটি টিভি চ্যানেলে এক ভোট-তাত্ত্বিক জ্ঞান বিলোচ্ছিলেন। দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ যখন বে-আব্রু হয়ে পড়েছে যে বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্ক তলানিতে পৌঁছচ্ছে, বিজেপি তৃণমূলের সঙ্গে সমানে টক্কর দিচ্ছে তখন সেই তাত্ত্বিক তাঁর ছদ্ম-নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে বলে দিলেন 'মার্কসবাদী' ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করছে। এরপর তৃণমূলের ফলাফলে বেজায় হতাশ তৃণমূলির আর তাদের বৌদ্ধিক মদতদাতা 'শহুরে নকশাল'রা একটা থিওরি প্রচার করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেল বাম ভোট বিজেপি-তে আসতেই বিজেপির নাকি এই সাফল্য। সঙ্গে হাতে গরম পরিসংখ্যান গতবার অর্থাৎ ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট প্রাপ্তির হার ছিল প্রায় ১৭ শতাংশ, এবার ২৩ শতাংশ বেড়ে তা ৪০ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৪-য় বামেরা পেয়েছিল প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট, এবার যা ২৩ শতাংশ কমে ৭ শতাংশে ঠেকেছে। অর্থাৎ বামেদের ২০১৪-র ২৩ শতাংশ ভোট ২০১৯-এ বিজেপির বাড়তি ২৩ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

বাম-তাত্ত্বিকেরা এখন নতুন একটি থিয়োরির আমদানি করেছেন। সেটি হলো প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। যার সরল মর্মার্থ হলো তৃণমূলের মুসলমান তোষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির হিন্দু তোষণ। ভারতবর্ষের আরও বিশেষ করে বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য এদেশে সংখ্যাগুরুর দাবি-দাওয়া আদায় করতে রাজনৈতিকভাবে পথে নামতে হয়, তাতে কিছু জোটে, কিছু জোটে না। কারণটাও খুব সহজ। মমতা ব্যানার্জি খুব সরলভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে গোরু দুধ দেয়, তার পদাঘাত সহ্য করা উচিত। এই দুধেল গাই হিসেবে মুসলমানদের রাজনৈতিক তোয়াজ করার শিক্ষা তিনি সিপিএমের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব আমলে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল মুসলিম লিগের দোসর। লিগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা বলেছিল 'পাকিস্তান দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' এমনই দুর্ভাগ্য দেশের স্বাধীনতার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি করে স্থায়ী একটা ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে নিয়েছিল বামেরা। উদ্বাস্তুরা বুঝতেও পারেনি, তারা বামেদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বামেদের 'বুর্জোয়া', 'সামন্ত্রতান্ত্রিক দাসত্ব' ইত্যাদি স্লোগান তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে ভালো মানিয়েছিল।কারণ একদিকে ছিল কিছু কংগ্রেসি ভোটব্যাঙ্ক, যারা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট উন্নত; অন্যদিকে বামপন্থীদের ভোটব্যাঙ্ক, যার পুঁজি সর্বহারা, দরিদ্র, নিরন্ন মানুষ। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যই বামপন্থীদের রাজনৈতিক সম্বল। এগুলি সবই ৪৭-এর পরবর্তী সময়ের কথা। মুসলমান তোষণের চোরাস্রোত তখনও ছিল, কিন্তু দেশভাগের গভীর ক্ষত নিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমান তোষণের অনুকূল পরিবেশ তখনও তৈরি হয়নি। মুসলমান দেশের বিপরীতে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র'-এর বঞ্চনা, যদিও ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে সাংবিধানিক নির্মাণের রূপকার ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু জওহরলাল নেহরু তার প্রায়োগিক দিকের বীভৎসতা বহু আগেই উন্মোচন করে দিয়েছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মাহুতি যার গভীরতম ক্ষত। ১৯৭৭ সালের বামফ্রন্ট যখন রাজ্যে ক্ষমতায় এল তখন রাজনীতির জল অনেকদূর গড়িয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগী থাকার কারণে আদি কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই-এর হাল তখন শোচনীয়। নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা বিরোধিতা (যদিও একমাত্র জ্যোতির্ময় বসু (জ্যোতি বসু নন) ছাড়া আর কোনো নেতাই গ্রেপ্তার হননি) ইত্যাদি কারণে চীনা আক্রমণের সমর্থনকারী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিআই(এম) তখন বামফ্রন্টের নিয়ন্ত্রক হিসেবে রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। প্রসঙ্গত, সিপিআই বামফ্রন্টে যুক্ত হয়েছে ১৯৮২ সালে। যাই হোক, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানের খান সেনাদের

বিরুদ্ধে বাংলাদেশিদের লড়াইয়ে ৪৭-এর দেশভাগের দগদগে ক্ষত কিছুটা নিরাময় হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হিন্দুদের মনে।

'৭৭-এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসে এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করল বামফ্রন্ট। মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধে দিয়ে, অনেকটা নাকের সামনে গাজর ঝুলিয়ে তা ধরার লক্ষ্যে দৌড় করানোর মতো, তাদের ভোটগুলিকে কুক্ষিগত করে ফেলল। তৈরি হলো এদেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে বাঙ্গলার রাজনীতিতে একটি নতুন শব্দ 'মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক'। আজ যাঁরা 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'র তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি এই স্বাধীন বঙ্গে তারাই প্রথম এনেছিলেন ক্ষমতায় থাকবার সুরক্ষা কবচ হিসেবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল সেকুলারিজমের মোহে।

অঙ্কের হিসেব বহুদিন পর্যন্ত ঠিকই ছিল, পাশার দান উল্টোল না সিঙ্গুর নয়, মুসলমান প্রধান নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। রাজ্যে সিপিএম-বিরোধী একমাত্র মুখ হিসেবে মমতা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে ১৯৮৪ সালে সাংসদ হওয়া থেকেই মান্যতা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনওদিনই খুব এঁটে উঠতে পারেননি কারণ তাঁর পাশে মুসলমানরা ছিল না। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর ইমাম, মুয়াজ্জিন, পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি সিদিকুল্লা, সাংবাদিক ইমরানের মতো মুসলমান সমাজের কেষ্টবিষ্টুদের হাত মাথায় নিয়ে মমতার রাজ্যাভিষেক । তথাগত রায়ের ভাষায় সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী এরপর তাঁর গুরুকেও টপকে যান। উগ্র মুসলমান তোষণ একদিকে দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, ডায়মন্ডহারবারের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত স্থানে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে, অন্যদিকে খাগড়াগড়, মেটিয়াবুরুজের মতো এলাকার ঘটনায় জেহাদিরাও যে এরাজ্যে প্রশাসনিক মদত পাচ্ছে তা বেআহব্রু হয়ে পড়ে।

সিপিএম বুদ্ধি করে যে সম্প্রদায়কে তাদের নির্বাচন জেতার তুরুপের তাস করেছিল, মমতার একইপন্থা কিন্তু নির্বুদ্ধিতা, সেকুলারিজম-এর মুখোশের আড়ালে কদর্য মুখটাকে হিন্দুদের সামনে তুলে ধরল। এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে কখনও যা হয়নি, এবার ঠিক সেটাই হলো। হিন্দুরাও অধিকার সচেতন হয়ে তাদের ব্লকভোট তৈরি হলো। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তাঁদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনে শামিল হলেন এরাজ্যে, বিজেপির হাত ধরে। এই সময় মুসলমানরা আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরল তৃণমূলকে। মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলাগুলির দিকে তাকালেই তা প্রমাণ হবে। একদা কংগ্রেসি গড়, তৃণমূলের কিছু সংগঠন না থাকলেও আজ তা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, মুসলমানদের সৌজন্যে।

পাশাপাশি মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হিন্দুরাও যে একত্রিত হচ্ছেন তার প্রমাণ দিয়ে রেখেছে মালদা জেলার দু'টি আসন। উত্তর মালদায় বিজেপি জিতেছে, দক্ষিণ মালদা অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। মূলত প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনিখান চৌধুরীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও তাতে কাজ করেছে। ঠিক যেমনটি হয়েছে



তেহট্ট হাইস্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে পড়ুয়াদের পথ অবরোধ। (ফাইল চিত্র)

বহরমপুরে, সেখানে কংগ্রেস নেতার অধীর রঞ্জন চৌধুরী ব্যক্তি ইমেজ কাজ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থীরা এলাকার জনপ্রিয় মুসলমান হলেও নিজের সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে কল্কে পাননি, মমতার তোষণ নীতির পরিণামে।

হতেই পারে যে, সব মুসলমান বিশেষ করে তিন তালাকের শোচনীয় পরিণামের স্বীকার মুসলমান মহিলারা এবার তৃণমূলের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তৃণমূলের প্রাপ্ত ৪৩ শতাংশ ভোটের সিংহভাগই যে মুসলমান সমাজের আর রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের যে নির্দিষ্ট অংশ ভোট দিয়েছে, তারও সিংহভাগ মমতার ঝুলিতেই গিয়েছে। এছাড়া সেই বিশেষ একটি সম্প্রদায় যারা হিন্দুর পরিচয়ে 'সেকুলার' সেজে হিন্দুসমাজকে দীর্ঘদিন পথভ্রষ্ট করেছেন, যারা দীর্ঘদিন বাম ছিলেন, বর্তমানে অতি-বাম হয়ে তৃণমূল হয়েছেন, 'বিজেপিকে রুখতে তৃণমূল চাই' স্লোগানে রাজ্যটাকে ব্যতিব্যস্ত করে, তাঁরাও মমতাদেবীর ভোটঝাঁপি ভরেছেন।

তাই কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সিপিএমেরই একদা দুই বিশ্বস্ত দোসর, স্বাধীনতার আগে থেকেই, মুসলমান সম্প্রদায় ও তথাকথিত হিন্দু-নামধারী 'সেকুলার' সমাজ এবার মমতা ব্যানার্জিকে ৪২-এ ৪২-এর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু এই দুধেল গাইয়ের লাথি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ্য করলেও, রাজ্যের বহু বছরের শোষিত, বঞ্চিত হিন্দুরা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের এককাট্টা ৪০ শতাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছে, হিন্দুদের ভরসাযোগ্যতার চিহ্নস্বরূপ। মমতা এই পরিস্থিতির আঁচ পেয়েছিলেন, তাই রামনবমী জন্মাষ্টমীতে হিন্দুদের মন জয়ের কিছু চেষ্টা হয়েছিল। যদিও ভবি ভোলে না। একদিকে রোহিঙ্গা, আর অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে তিনি ভারতীয়দের পেটের ভাত কাড়বেন, থাকার জায়গা কাড়বেন আর হিন্দুদের ভোট পাবেন— এটা হয় না। হয় না বলেই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় 'তুলনামূলক সাম্প্রদায়িকতা কিংবা তৃণমূলি বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় 'মেরুকরণ'। আর হিন্দুরা বলেন, 'দেশপ্রেমিকদের একজোট হওয়া।'

একথা ঠিক যে গ্রাম বাঙ্গলার মানুষ মুসলমান মৌলবাদের ভয়াবহতা নিয়ে যেভাবে সচেতন, ভুক্তভোগী হওয়ার কারণেই, শহরের মানুষ ততটা নন। তার সেটা নন বলেই তৃণমূল এবার তাদের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে। 'সেকুলারিজম'-এর ভূত গ্রামবাঙ্গলার মানুষের ঘাড় থেকে নেমেছে, শহরের মানুষও ২০২১-এর জন্য তৈরি হচ্ছেন এদের ঝেড়ে ফেলতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কান পাতলে সেকুলারিজমের ঠিকাদারদের ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে। ■



গেরুয়া ঝড়ে টালমাটাল সবুজের দন্ত

চন্দ্রভানু ঘোষাল

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা কথা খুব চলে। সিপিএমকে শেষ করেছিল জঙ্গলমহল আর মমতাকে শেষ করবে পাহাড়। গত কয়েক বছর ধরেই মমতার প্রতি পাহাড়ের মানুষের একটা বীতশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে সেটি আরও স্পষ্ট হলো। দার্জিলিং বিজেপির ছিলই। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহারও এবার ঝুলিতে চলে এল।

২০১৩ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে বিমল গুরুঙ্গকে জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন। গুরুঙ্গের আপত্তি অগ্রাহ্য করে জনজাতিদের নিয়ে একের পর এক বোর্ড গঠন করেছেন। মমতা বুঝতেই পারেননি পাহাড়ের মানুষ তাঁর এই বিভাজননীতি মোটেই পছন্দ করছেন না। তাই বিমল গুরুঙ্গ অন্তরালে থেকেও 'হিরো' হয়ে যান এবং যার প্রভাব এবারের নির্বাচনে খুব ভালোভাবেই পড়েছে। জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত। অন্যদিকে এই ফল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের মণি বিনয় তামাংয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত অনিশ্চিত করে তুলেছে। বিনয় তামাং জিটিএ চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। হেরেছেন ৪৬ হাজার ২৮৫ ভোটে। জয়ী হয়েছেন বিজেপি সমর্থিত জিএনএলএফ প্রার্থী নীরজ জিম্বা।

বিমল গুরঙ্গের অদৃশ্য উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেও। তরাই-ডুয়ার্সে সাড়ে তিন লক্ষ গোর্খার বসবাস। শোনা যাচ্ছে বিমল গুরুঙ্গের অপমানের বদলা নিতে এবং নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের বার্তায় ভরসা রেখে তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। শুধু গোর্খারা নন, তরাই-ডুয়ার্স চা-বলয়ে বসবাসকারী প্রতিটি জনজাতি সম্প্রদায় এবার তৃণমূলের দিক থেকে মুখফিরিয়ে নিয়েছে। প্রবল গেরুয়া ঝড়ের প্রভাবে পড়েছে কোচবিহারের কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতেও। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের দাম্ভিক আচরণ, স্বজনপোষণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে না পারার ক্ষোভ। কোচবিহারে তিন শতাধিক বুথে রিগিং করেও রেহাই পায়নি তৃণমূল।

রায়গঞ্জে এবার অন্য ছবি দেখা গেছে। বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী লড়াই শুরুই করেছিলেন সাম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে। পুঁজি ছিল লাখ দুয়েকের ভোটব্যাঙ্ক। ইন্ধন জুগিয়ে ছিল দাড়িভিটে স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনা। দেবশ্রী একটানা জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশভক্তির কথা বলে গেছেন। পাশাপাশি উসকে দিয়েছেন দাড়িভিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী ভূমিকার কথা। অন্যদিকে রায়গঞ্জের বিদায়ী সাংসদ সিপিএমের মহম্মদ সেলিম এবারের নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কংগ্রেসের দীপা দাসমুন্সীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। দেবশ্রীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মূলত তৃণমূলের কানাইয়ালাল আগরওয়ালের। কানাইয়ালালের মূল পুঁজি ছিল মুসলমান ভোট। ইসলামপুর (মুসলমান ভোট ৭২ শতাংশ), গোয়ালপোখরের দুটি ব্লক (মুসলমান ভোট ৭৪ শতাংশ ও ৬৪ শতাংশ) এবং হেমতাবাদ (মুসলমান ভোট ৫০ শতাংশ) তৃণমূলকে লিড দিয়েছে। একথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, এবারের নির্বাচনে মুসলমানরা তৃণমূলকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। এবং যে ২২টি আসন তারা পেয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে মুসলমানরা।

ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পঞ্চায়েত ভোট যে ইঙ্গিত দিয়েছিল লোকসভা নির্বাচনে সেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল। উন্নয়নের জোয়ারে 'জঙ্গলমহল হাসছে'— এই চটকদারি স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চেয়েছিল শাসকদল। কিন্তু মিথ্যে স্লোগান

মন ভরেনি মানুষের। ভয়ংকর রকমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সঠিক নেতা নির্বাচনের অক্ষমতা কাল হয়েছে শাসকদলের। ২০১৪ সালে নির্বাচনে তৃণমূলের উমা সোরেন ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে তিন লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এবারের তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা সোরেন সেই লিড ধরে রাখা দূরের কথা এগারো হাজার ভোটে হেরেছেন। বিজেপি প্রার্থী কুনার হেমব্রমের শিক্ষিত ও পরিশীলিত ভাবমূর্তি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তৃণমূল আশা করেছিল সিপিএম প্রার্থী দেবলীনা হেমব্রম বিজেপির ভোট কাটতে না পারুন নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পারবেন। হয়েছে তার উল্টো। বিজেপির ভোট যেমন বেড়েছে সিপিএমের ভোট লক্ষণীয় ভাবে কমেছে। সামাগ্রিকভাবে এবারের নির্বাচনে বাম ভোটাররা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। যার ফলে বিজেপির ভোট শতাংশ ২০১৪ সালের ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯-এ ৪০ শতাংশে পৌঁছে গেছে। মার্কসবাদী কর্মী-সমর্থকেরা জানেন তৃণমূলের অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা বর্তমান সিপিএমের নেই। তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন বিজেপি। ক্ষমতার লড়াইও এই দুই দলের মধ্যে। তৃণমূল যদি বেশি আসন ফেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা হলে তাদের বিপদ আরও বাড়বে। তাই তারা ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং মেদিনীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষের নানা সময়ে লড়াই সাধারণ মানুষকে তো বটেই, বাম ভোটারদেরও সাহস জুগিয়েছে। ভোটের আগে তরুণ প্রজন্মের ভোটারদের মুখে শোনা গেছে, এই তৃণমূলকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে, তা বিজেপি। তাই তৃণমূল বিরোধী সমস্ত ভোট, এমনকী বামেদের ভোটের অধিকাংশ পড়েছে বিজেপির ঝুলিতে। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ছবিটা একটু অন্যরকম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজের মতামত প্রয়োগ করতে না পারার পাশাপাশি একাধিক বিজেপি কর্মীর খুন হওয়া সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে সেই সময়, যখন মাওবাদীদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। ফলে বিজেপি প্রার্থী জোতির্ময় সিংহ মাহাত বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। এবারের নির্বাচনে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদী যেসব জায়গায় সভা করেছেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থীরা ভালো ফল করেছেন। বস্তুত প্রচারে ঝড় তুলে নরেন্দ্র মোদী একাই পশ্চিমবঙ্গের রং পালটে দিয়েছিলেন। মোদীর প্রতি আমবাঙ্গালির সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে ইভিএমে।

নরেন্দ্র মোদীর সভার কথা যখন উঠলই তখন বনগাঁ কেন্দ্রের কথা বলতেই হবে। মতুয়া সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি ভারতীয় নাগরিকত্বের। ঠাকুরনগরের সভায় নরেন্দ্র মোদী এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন নাগরিকত্ব বিল সংসদে পাশ হলে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-শিখ-পারসি ধর্মাবলম্বী প্রতিটি মানুষকে নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকার। সেই সঙ্গে ফেরত পাঠানো হবে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের আর কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। তবে বনগাঁয় যাই হোক তৃণমূল কংগ্রেস জবরদস্ত ধাক্কা খেয়েছে হুগলিতে। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিঙ্গুর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক আখের গোছাতে সিঙ্গুরকে ব্যবহার করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেননি। উপরন্তু, ভোট গ্রহণের কয়েকমাস আগে টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে ৬০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করে সিঙ্গুরের মানুষের বহুদিনের একটি ইচ্ছে পূরণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সিঙ্গুরের মানুষ অনেকদিন ধরেই চাইছেন টাটারা ফিরে আসুন। এই উত্তপ্ত পরিবেশে সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল হেরেছে ১০,০০০ ভোটে। আসানসোলে বাবুল সুপ্রিয় ছিলেন বিজেপির অন্যতম হেভিওয়েট প্রার্থী। রায়গঞ্জের দেবশ্রীর মতো বালুলও নির্বাচনী লড়াই শুরু করেছিলেন সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে। প্রতিদ্বন্দ্বী মুনমুন সেন কোনও সময়েই দাগ কাটতে পারেননি। তার ওপর নানারকম ছেলেমানুষী মন্তব্য করে মিডিয়ার কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিলেন। খুব সহজেই জিতেছেন বাবুল। প্রায় সব বিধানসভা কেন্দ্রেই অনায়াস জয় এসেছে।

বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রার্থী সুরিন্দার সিংহ আহলুওয়ালিয়া অবশ্য বাবুলের মতো স্বস্তিতে ছিলেন না। একে তো তার পুরনো লোকসভা কেন্দ্র দার্জিলিং অন্য প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রটি বামদুর্গ নামে এক সময় পরিচিত ছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষপর্যন্ত আহলুওয়ালিয়াজী জেতেন। বারাকপুরের প্রার্থী অর্জুন হিংহের কাজটিও খুব সহজ ছিল না। তাকে হারাবার জন্য তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভোটের দিন সকাল থেকেই অশান্তি শুরু করেছিল। দুষ্কৃতীদের তাড়া করতে গিয়ে অর্জুন একবার পড়েও যান। কিন্তু হাল ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত ১৩,১৯০ ভোটের ব্যবধানে জেতেন।

এবারের নির্বাচনে একটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। একদা বামদুর্গ নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের বামভোট অধিকাংশ বিজেপির ঝুলিতে গেছে। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ অংশের ভোটও পেয়েছে বিজেপি। ফলে বিজেপির ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে পাওয়া ১০ শতাংশ ভোট ২০১৯ সালে পৌঁছে গেছে ৪০ শতাংশ। অন্যদিকে তৃণমূলের ৪৫ শতাংশ ভোট কমে হয়েছে ৪৩ শতাংশ। ব্যবধান মাত্র ৩ শতাংশের। লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভাওয়াড়ি ফলাফলে চোখ রাখলে বোঝা যাচ্ছে, বিজেপি মোট ১২৯টি বিধানসভা আসনে জিতেছে। তৃণমূলের জয় ১৫৮টি আসনে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা যে প্রবল সেকথা বলাই বাহুল্য। নির্বাচনের আগে মমতা স্লোগান দিয়েছিলেন, ২০১৯ বিজেপি ফিনিশ। এখন তিনি বুঝতে পারছেন বিজেপির নয় তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো শুধু কঠিন নয়, একরকম অসম্ভব। ■

অপ্রতিরোধ্য পশ্চিমবঙ্গেও গেরুয়া সুনামি

বিনাশের পথে তৃণমূল কংগ্রেস



সনাতন রায়

যদি এক কথায় জানতে চাওয়া হয়— এবার লোকসভা ভোটের মূল প্রাপ্তি কী কী? উত্তর খুব স্পষ্ট।

(ক) আঞ্চলিক রাজনীতি খতম। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির ওপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে।

(খ) বামপন্থার জামানত জব্দ। প্রায় গোটা দেশেই বামপন্থীরা এখন ফকির।

(গ) কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলির মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কফিনে দেরিতে হলেও মানুষ শেষ পেরেকটা পুঁতে দিয়েছে।

(ঘ) মানুষ বিশ্বাস রেখেছে জাতীয়তাবাদ ও বোধের ওপর।

(ঙ) হিন্দুত্বই আসল ধর্মনিরপেক্ষতা— মানুষ এই তত্ত্বের সপক্ষে রায় দিয়েছে।

(চ) নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর মতো লৌহসম ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসকের ওপর ভরসা রেখেছে মানুষ। ভরসা রেখেছে তাঁর সংস্কার পন্থায়।

(ছ) ভরসা রেখেছে অমিত শাহর মতো দলীয় সংগঠকের ওপর যিনি সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে গোটা দেশের অশুভ রাজনৈতিক শিবিরগুলিকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পেরেছেন।

জাতীয় স্তরে যখন মূল প্রাপ্তি এগুলিই, তখনই একবার বুঝে নেওয়া যাক রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিগুলি। জাতীয় স্তরে প্রাপ্তিগুলি এ রাজ্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৃণমূলি তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিসদৃশ এবং অনভিপ্রেত নির্লজ্জ জনবিরোধী রাজনীতি যুক্ত করেছে আরও কয়েকটি প্রাপ্তিকে। যেমন :

(ক) রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানকে মানুষ নস্যাৎ করে বিরোধীপক্ষেই সায় দিয়েছে বেশিমাত্রায়।

(খ) পাহাড়ে ও জঙ্গলমহলে তোষণ এবং হিন্দুত্বের বিরোধিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মানুষ।

(ঘ) মুসলমান তোষণ হয়েছে ইমাম ভাতা আর বৃত্তি দিয়ে। কিন্তু মুসলমানদের মূল উন্নয়ন কিছু হয়নি তা বুঝেছে মুসলমান জনগোষ্ঠীই।

(ঙ) তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে মানুষ।

(চ) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেন তেন প্রকারেণ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় চিরতরে জল ঢেলে দিয়েছে জনতার রায়।

(ছ) প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্লজ্জ এবং অসাংবিধানিক ভাষা উগরে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা এবারের ভোটের ফলাফলে প্রমাণিত।

(জ) মুকুলবিহীন তৃণমূল কংগ্রেস জিরো, প্রমাণিত তাও।

গোটা ভারতবর্ষে যখন ৫৪২ আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ৩০৫টি আসনে বিপুল জয় পেয়েছে, যখন কংগ্রেসের মতো জাতীয় দল সংখ্যার বিচারে নেমে এসেছে ৪৯-এ, যখন কংগ্রেস তার শরিকদলগুলি সহ জয়ী হতে পেয়েছে কোনোরকমে মাত্র ৮৫ আসনে, যখন সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ হাজারো চুনোপুঁটি মিলেও ১০৫-এর বেশি আসনে জয়ের পতাকা তুলতে পারেনি, তখন পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলটা কেমন? একবার দেখে নেওয়া যাক।

মোট আসন : ৪২

তৃণমূল কংগ্রেস গোটা দেশ জুড়ে আওয়াজ তুলেছিল— এবার ভোটে ৪২-এ ৪২টিই পাবে তৃণমূল। পেয়েছে ২২।

বিজেপির লক্ষ্য ছিল ২২টি আসন। প্রাপ্তি ১৮।

বামপন্থীদের একজন প্রার্থী ছাড়া জামানত জব্দ হয়েছে সব প্রার্থীর। পরাজিত সকলেই।

কংগ্রেসের প্রাপ্তি দুটি আসন।

কিন্তু ফলাফলটা এখানেই শেষ নয়। ২০১৪ সালের ভোটের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা না করলে অস্পষ্ট থেকে যাবে যে গেরুয়া ঝড় এবার কতখানি তীব্র ছিল।

২০১৪-য় পশ্চিমবঙ্গে ঘাসফুলের



ঝড়কে নিষ্প্রভ করতে পারেনি মোদীঝড়। সেবার তৃণমূল পেয়েছিল ৩৪টি আসন। প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩৯.০৫ শতাংশ। বামফ্রন্ট অর্থাৎ লালশিবির পেয়েছিল ২টি আসন। ভোটপ্রপ্তির হার ছিল ২৯.৭১ শতাংশ। বিজেপিও জিতেছিল ২টি আসনে। ভোটপ্রাপ্তির হার ১৭.০২ শতাংশ। অন্যদিকে মাত্র ৯.৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস কিন্তু ৪টি আসনে জয় পেয়েছিল। মাঝে ২০১৬ সালে হলো রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। সেবারও তৃণমূলের জয়জয়কার। প্রাপ্ত আসন ২১৩। প্রাপ্ত ভোট একলাফে পৌঁছে গিয়েছিল ৪৫ শতাংশে। বিষাদ নেমেছিল গেরুয়া শিবিরে। তার ভোটপ্রাপ্তির হার ২০১৪-র ১৭.০২ শতাংশ থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১০ শতাংশে।

ফিনিক্স পাখির মতো ডানা মেলে ওড়ার, পুনর্জাগরণের মূল ইন্ধন ছিল এই পরাজয়। সেটা স্পষ্ট এবারের ফলাফলে। এবার তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১৬-র তুলনায় ২ শতাংশ কম। আর বিজেপির প্রাপ্তি ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১৬-র তুলনায় বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এবার লোকসভা ভোটের সঙ্গেই ৮টি বিধানসভার উপনির্বাচনও হয়েছে। তৃণমূল জিতেছে ইসলামপুর, নওদা, উলুবেড়িয়া এবং কান্দি আসনে। প্রাপ্ত ভোট ৩৭.০৪ শতাংশ। বিজেপি জিতেছে দার্জিলিং, হবিবপুর, কৃষ্ণগঞ্জ ও ভাটপাড়ায়। প্রাপ্ত ভোটের হার তৃণমূলের থেকে সাড়ে তিন শতাংশ বেশি— ৪০.৫০ শতাংশ।

তৃণমূল সুপ্রিমো এবার ডাক দিয়েছিলেন কর্পোরেশন, পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিতে দায়িত্বশীল পদাধিকারীদের সকলকে ভোটে লিড দিতে হবে তৃণমূলের সপক্ষে। যেখানে যত বেশি ভোট সেখানে তত বেশি টাকা দেওয়া হবে পুরস্কার হিসেবে। ফলাফলটা কী হলো দেখে নেওয়া যাক।

কলকাতা পুরসভা ৬৫টি ওয়ার্ডে তৃণমূল হেরেছে যাচ্ছেতাই ভাবে। এর মধ্যে আছে রাসবিহারী, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর। বিধাননগর পুরসভার বেশিরভাগ আসন তৃণমূলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। বারাসাত পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডে ভয়ংকরভাবে পিছিয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র ভর্ৎসনা এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে রাজ্যের ১৬ জন মন্ত্রী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হঠাৎ করে ফকির থেকে রাজা হয়ে যাওয়া (বৃদ্ধবয়সে প্রথম মন্ত্রী হওয়া) শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গের মস্তান দি গ্রেট মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিষ্কর্মা পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব, হুগলির কোণঠাসা নেতা তপন দাশগুপ্ত, রক্তচক্ষু বুলি সম্বল যার সেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, হাওড়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ছাপ্পা ভোটে সিদ্ধহস্ত লক্ষ্মীরতন শুক্লা, একদা বামপন্থী দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, বাচ্চু হাঁসদা



প্রমুখ। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যিনি ব্যারাকপুর ও বনগাঁ আসনে বিজেপি মিলিয়ে যাবে বলে আস্ফালন করেছিলেন, তাঁর নিজস্ব নির্বাচনী ক্ষেত্র হাবড়াতেই বিজেপি ২০ হাজার ভোটে লিড পেয়েছে। সুজিত বসুর জেতা বিধানসভা কেন্দ্র বিধাননগরেও বিজেপি এগিয়ে ১৯ হাজার ভোটে। হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্ত পরাজিত হলেও লক্ষণীয় বিষয় হলো ২০১৪-র তুলনায় বিজেপি এবার দ্বিগুণেরও বেশি ভোট পেয়েছে। ২০১৪ বিজেপি হাওড়া সদর কেন্দ্রে ২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার বিজেপি পেয়েছে ৪১ শতাংশ। হাওড়ার মুসলমান ভোট তৃণমূল ধরে রেখেছে বলেই রন্তিদেব সেনগুপ্তর পরাজয় হয়েছে।

দমদমে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য এবার সাড়ে চার লক্ষ ভোট পেয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় জিতেছেন মাত্র ৫৩ হাজার ভোটে। তারপর নিজেই চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করেছেন— 'বিজেপি আমার কেন্দ্রে এত ভোট পেয়েছে দেখে আমি বিস্মিত।'

বিস্ময় ব্যারাকপুরেও। আমডাঙ্গা ছাড়া সর্বত্র বিজেপি সামান্য ভোট হলেও এগিয়ে। নৈহাটিতে ২০০০ ভোটে, বীজপুরে (এখানকার বিধায়ক মুকুল রায় পুত্র শুভ্রাংশু রায়) ৭৫০০ হাজার ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল। জগদ্দলেও তৃণমূলের হাল বেশ শোচনীয়।

হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে— এবার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে ২৯৪টা বিধানসভা কেন্দ্রের ১২৯টিতেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। তৃণমূল দখলে রাখতে পেরেছে ১৫৮টি।

প্রশ্ন হলো : এই ফলাফলের জন্য দায়ী কোন কোন ফ্যাক্টর?

মোদী/বিজেপি ফ্যাক্টর

মোদীর ক্যারিশমা, দেশজুড়ে গেরুয়া ঝড় তোলা, এ রাজ্যে ১৮টি ভিড়েঠাসা জনসভা করা, মমতার তীব্র মোদী বিরোধিতার যুক্তিপূর্ণ এবং যোগ্য জবাব দেওয়া, বিরোধীদের অনৈতিক জোটের মুখোশ খুলে দেওয়া, মোদীর অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফলের সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হওয়া এবং রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে



নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তী, মুনমুন সেন, দেবের মতো প্রার্থীদের দিয়েই সস্তায় বাজিমাত করাটা মমতার উদ্দেশ্য। সৎ এবং স্বধর্মোচিত রাজনীতি করার কোনও সদিচ্ছাই তাঁর নেই। অতএব ফল যা হবে তা স্পষ্ট।

কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গদান বিজেপির জয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

মমতা/তৃণমূল ফ্যাক্টর

মমতার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, নিজের স্ট্রিট ফাইটার ইমেজকে ত্যাগ না করতে পারার ব্যর্থতা, এত বছর পরেও তৃণমূল দলটিকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে না পারার ব্যর্থতা, তাঁর অযৌক্তিক দাবি দাওয়া ও অকারণ কেন্দ্র তথা মোদী বিরোধিতা, বস্তির ভাষায় কথা বলা, ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতির সব বাঁধ ভেঙে মিথ্যাচারকে সঙ্গী করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য জিভের লালা ফেলা, মাওবাদীদের সাহায্যে ক্ষমতায় এসে মাওবাদীদের খুন করা এবং যে কোনো মানুষকে মাওবাদী বলে জেলে পোরা, এমনকী নিজের দলীয় মন্ত্রী থেকে সাধারণ কর্মী, মুখ্যসচিব থেকে সামান্য পুলিশ কনস্টেবল সবাইকে ব্যক্তিগত ভৃত্যে পরিণত করার মানসিকতা— এ সবই খুব বড়ো মাপের অনুসঙ্গ হিসেবে গোটা দলটাকেই পাঠিয়ে দিয়েছে ভাগাড়ে।

তার ওপর তীব্রভাবে কাজ করেছে দলের অভ্যন্তরে সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব, আদি তৃণমূল এবং নব্য তৃণমূলের আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব, পরিবারতন্ত্রে মমতার স্পষ্ট সায় এবং নিজের ভাইপোকে তুলে আনার জন্য দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের পদে পদে অপমান করা, মুকুল রায়ের মতো সংগঠন বোদ্ধা নেতাকে অপমান করে দল থেকে তাড়ানো, মুসলমান তোষণ, ক্লাব এবং পুজো কমিটিগুলিকে কোটি কোটি টাকা বিতরণ করা নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বও দলকে অস্তিত্বহীন করে তোলার পথে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটাই।

এবার কী হবে?

সৌগত রায় জিতেও বিস্মিত। আর বাকিরা যারা শিকার হলেন লিড না পেলে সিট নয় তত্ত্বের অর্থাৎ ২০২১-এ আর টিকিট পাবেন না তাঁরা। এবার তাঁরা কী করবেন? মোদীজী তো প্রকাশ্য জনসভাতেই ফাঁস করে দিয়েছেন, তৃণমূলের ৪০ জন নেতা-মন্ত্রী বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। ভোটের ফল প্রকাশের পরই মুকুল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন শতাধিক বিধায়ক ও সাংসদ। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদও বুঝতে পারছেন, তাঁকে কলকাতা ছেড়ে বাঁকুড়ায় পাঠানো হয়েছিল হারানোর জন্যই। বহু নেতাই বুঝে গেছেন, নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তী, মুনমুন সেন, দেবের মতো প্রার্থীদের দিয়েই সস্তায় বাজিমাত করাটাই মমতার উদ্দেশ্য। সৎ এবং স্বধর্মোচিত রাজনীতি করার কোনও সদিচ্ছাই তাঁর নেই। অতএব ফল যা হবে তা স্পষ্ট। হয়তো ২০২১-এর অনেক আগেই তৃণমূল কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটিকে ঘাসের মতোই পদদলিত করে দলের লক্ষ্মণরেখা পার করবেন শত শত বিধায়ক, সাংসদ, কর্মীবাহিনী। কারণ এবার গেরুয়া টর্নেডো গোটা ভারতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে না। থাকতে পারে না। অপেক্ষা হাতে গোনা কয়েকটা মাসের মাত্র। ■

জামাইষষ্ঠী : বাৎসল্যের রসঘন অনুষ্ঠান



নন্দলাল ভট্টাচার্য

হিন্দুর প্রতিটি অনুষ্ঠানই দ্বিমাত্রিক। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে কিছু ধর্মীয় অনুশাসন, নিয়ম-বিধি। একই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানই পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধে পরিশীলিত। আশ্চর্য মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহরসে সঞ্জীবিত। আর সেই কারণেই অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে হিন্দুর মনন, চিন্তন ও পারিবারিক বন্ধনের এক রূপময় চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্য দিয়ে পারিবারিক সমাজবন্ধনের রূপটিও স্পষ্ট হয়। হিন্দুর এমনই দুটি অনন্য অনুষ্ঠান গ্রীষ্মের শুরুতে জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী এবং হেমন্তে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যদিও সাম্প্রতিক বিতর্কে অনেকেই অনুষ্ঠান দুটিকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একপেশে ভাবনা বলে মনে করেন। এই বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মা ও বোনেদের আন্তরিক স্নেহরসের যে সঞ্চার ঘটে তা এক কথায় অতুলনীয়।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতিথিতে হয় জামাইষষ্ঠী। সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রাথমিক পর্বে অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণভাবে নারী সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অনুষ্ঠিত। লোকাচার ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী পরিবারের গৃহিণী তার সন্তান-সন্ততি ও জামাতার কল্যাণ কামনায় অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে মরশুমি বিভিন্ন ফল এবং মিষ্টান্ন দিয়ে সন্তান ও জামাতাকে অভিনন্দিত করেন। অনুমান করা হয়, আদিতে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেইভাবে কোনো আলাদা পূজা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হতো না। যেটুকু অনুষ্ঠান করা হতো তাও পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াই মহিলারাই সম্পাদন করতেন। পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সন্তান- সন্ততির দেবী হিসেবে অর্চিত ষষ্ঠী পূজা যুক্ত হয়। এটি অরণ্যষষ্ঠী পূজা ও ব্রত হিসাবেই পরিপালিত হয়। কোথাও কোথাও একে আমিষ ষষ্ঠীও বলা হয়। অনুষ্ঠানটির মূল অঙ্গে প্রধান ভূমিকা মহলাদেরই। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ ঘরোয়া নামে পরিচিত। ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে বটপাতা, ধান-দূর্বা, খেজুর-সুপুরি, করমচা ইত্যাদি লাল সুতোয় জড়িয়ে যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয় তা সাধারণভাবে 'ষষ্ঠীর বাটা' নামে পরিচিত। পাখার ওপরে আম, জাম, কলা এবং ষষ্ঠীর অর্ঘ্য 'বাটা' রেখে গৃহিণী স্নানের পর জলে ভেজা ওই পাখার বাতাস দিয়ে সন্তান- সন্ততি ও জামাতাকে অভিসিঞ্চিত করেন। পরে মূলত ওই পাখার উপরেই ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। সংস্কৃতায়নের পরে ওই 'বাটা' বা বায়নার উৎস সম্পর্কে সংস্কৃত শব্দ 'বায়ন'-য়ের উল্লেখ করা হয়। রঘুনন্দনের তিথি তত্ত্ব এবং গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়া কৌমুদী'তে 'ব্যজনৈকরন্ত' শব্দটির কথা বলা হয়েছে। এখানে শুধু পাখার বাতাস দেওয়ার কথা বলা হলেও চণ্ডেশ্বরের কৃত্যরত্নাকরের গ্রন্থে আছে 'ব্যজনেযু কব্যঃ'। এরই অনুসরণে কেউ কেউ পাখা ও বাণ নিয়ে বনে গিয়ে ষষ্ঠীদেবীর পুজো করেন। এখন বনে না গেলেও তালপাতা কেটে ছোটো পাখা এবং ধনুকবাণ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পৌরাণিক

বিধি অনুসারে অরণ্যষষ্ঠীর পুজো হলেও এর মূল অঙ্গ ব্রত পালন এবং ব্রতকথা শ্রবণ। সন্তান-সন্ততী ও জামাতাদের আপ্যায়িত করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহিণীরা এইসব খাবার খান না। পরিবর্তে খান ফলমূল অথবা শীতল ফলার। তাঁরা ওইদিন কোনোরকম পক্কান্ন গ্রহণ করেন না।

ষষ্ঠীর ব্রতকথা হিসেবে দুটি কাহিনি প্রচলিত আছে। তার থেকে বোঝা যায় প্রথমদিকে এই জামাইষষ্ঠী বা ষষ্ঠীপুজো ছিল সম্পূর্ণ ভাবে লোকাচার সম্মত। পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবে পরবর্তীকালে অবশ্য একটি পুরাণ নির্ভর কাহিনি সংযোজিত হয়েছে। এই ব্রতকথাটি আছে ভবিষ্য পুরাণে। সেই কথা বলার আগে বরং শোনা যাক লোকায়ত কাহিনিটি।

বহুদিন আগের কথা। এক নগরে থাকতো এক ব্রাহ্মণী। তিন ছেলে, বউ নিয়ে ভরা সংসার। ব্রাহ্মণীর ছোটো ছেলের বউয়ের ছিল ভারী নোলা। যখন তখন চুরি করে খেতো আর দোষ দিত বেড়ালের। বেচারা বিড়াল বিনা দোষে এমন অপবাদে প্রতিবারই কেঁদে গিয়ে বলত মা ষষ্ঠীকে। মা শুনতেন। মনে রাখতেন। কিছু বলতেন না।

এই ভাবে কাটে দিন। কিছুদিন বাদে ছোটো বউ পোয়াতি হয়। যথা সময়ে জন্ম হয় একটি সুন্দর ছেলের। রাত্রিবেলা ছেলেকে কোলে নিয়ে শুয়ে আছে মা। সকালে উঠে দেখে ছেলে নেই। নেই তো নেই। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। মনের দুঃখে কাঁদে ছোটো বউ। কিছুদিন বাদে আবার তাঁর একটি ছেলে হয়। আগেরটির মতো এটিও উধাও হয়ে যায়। এইভাবে সাত সাতটি ছেলে হয় ছোটো বউয়ের। আর সাতটি ছেলেই নিপাত্তা হয়ে যায়।

ছোটো বউয়ের ভারী দুঃখ! বাড়ির সকলে তাকে বলে রাক্ষসী। সকলের গঞ্জনায় মনের দুঃখে ছেটো বউ চলে যায় বনে। এক গাছের তলায় বসে কাঁদে আর নিজেকে গালমন্দ দিয়ে বলতে থাকে আমি বড়ো পাপিষ্ঠ। এই জীবন আমি আর রাখবো না।

বউটির কান্নায় মা-ষষ্ঠী এক বুড়ির বেশে হাজির হন বউটির সামনে। বলেন বাছা, নিজের দোষেই তুমি এমন কষ্ট পাচ্ছ। ভেবে দেখোতো লোভের বশে নিজে চুরি করে খেতে আর দোষ দিতে বিড়ালকে। কাজটা কি খুব ভালো করতো? সেই পাপেই আজ তোমার এই অবস্থা।

বউটি বুড়ির পায়ে পড়ে বলে মা আমি মহা অপরাধী। নরকেও আমার জায়গা হবে না। কী করে এই পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবো দয়া করে বলে দাও। দয়া হয় মা-ষষ্ঠীর। বলেন বাইরে পড়ে আছে একটা মরা পচা বেড়াল। তার ওপরে এক হাঁড়ি দই ঢেলে দাও। পরে জিভ দিয়ে সেই দই তুলে হাঁড়ি ভর্তি করবে। তাহলেই ফিরে পাবে তোমার ছেলেদের।

ছেলেদের পাওয়ার আশায় বউটি তাই করে। তার ভক্তিতে তুষ্ট হয় মা ষষ্ঠী। ফিরে পায় ছেলেদের। ষষ্ঠী বলেন এবার থেকে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে আমার পুজো করবে। এই দইয়ের ফোঁটা ছেলেদের কপালে দেবে। বিড়ালকে কখনো লাথি মারবে না। তার ওপর মিথ্যে দোষও দেবে না। ছেলেদের কখনও বাঁ-হাতে মারবে না। 'মর' বলে গালি দেবে না।

মা-ষষ্ঠীর কথামতো ছেলেদের নিয়ে ছোটো বউ বাড়ি ফিরে যায়। প্রতিবছর সেই থেকে ছোটো বউ মা ষষ্ঠীর পুজো করতে থাকে। তার দেখাদেখি বাড়ির অন্য বউরাও একইভাবে ষষ্ঠীর ব্রত পালন করে। তাদের সংসারে সুখ একবারে উথলে ওঠে। তাদের দেখাদেখি নগরের আর সকলেও ষষ্ঠীপুজো শুরু করে। আর সেই থেকেই প্রতি বছর জামাইষষ্ঠী ব্রত পালনের প্রচলন শুরু হয়।

ভবিষ্য পুরাণের কথা, কার্তিকের অভিশাপে এক বিদ্যাধরকে সাত-সাতবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। জন্মের পর পরই হয় তার মৃত্যু। সমুদ্র সেন নামে এক সওদাগরের সুন্দরী মেয়ে সুমনার গর্ভে হয় তার জন্ম। সপ্তমবার গর্ভবতী হয়ে সুমনা বনে চলে যায়। সেখানেই সে মা-ষষ্ঠীর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে। যথাসময়ে সুমনার সপ্তম পুত্রটির জন্ম হয়। তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যাধরীরা এসে হাজির হন। বিদ্যাধর কিন্তু এবার মাকে ওভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে চায় না। বিদ্যাধরীদের বলে এভাবে অনাথা মাকে ছেড়ে যাওয়া ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। তাই সে এভাবে যেতে পারবে না। তবে কিছু শর্তের কথা জানিয়ে বলে শর্তভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যাধরীদের সাথে চলে যাবে।

সুমনা ঘুমের ভান করে ছেলের সবকটি শর্ত শুনে নেয়। তারপর গোপনে বাপের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে শর্তগুলি পালন করতে থাকে। প্রথম শর্ত মতে ঢাকঢোল বাজিয়ে নাচগানের সঙ্গে ছেলেকে বাড়িতে আনা হয়। নামকরণের সময় ছেলের নাম রাখা হয় গোবিন্দ। চূড়াকরণের সময়ে নাপিতকে আগে ভাগেই পারিতোষিক দিয়ে কী করতে হবে বলে দিয়েছিল। তাই মস্তক মণ্ডনের পর গোবিন্দ নাপিতের চুল কেটে দিলে সে এতটুকু না রেগে গোবিন্দের পায়ে পড়েই ক্ষমা চায়। একইভাবে অন্যান্য কাজও পালন করে জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠীদেবীর পুজো করে মা বিদ্যাধরকে বলেন বাবার অনুমতি ছাড়া অনাথা মা ও বালিকাবধূকে ত্যাগ করা শাস্ত্রবিধিত নয়। যদি শাস্ত্র লঙ্ঘন করতেই চাও তাহলে আমাকে বধ করে যেতে হবে। বিদ্যাধর এবার আর যেতে পারে না। শুধু বিদ্যাধরীদের বলে এবার তোমরা যাও। আমি পরে তোমাদের কাছে যাবো। সেই থেকে দেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অরণ্য ষষ্ঠীর পুজো হতে থাকে।

সব মিলিয়ে জমাইষষ্ঠী বা অরণ্যষষ্ঠী বাৎসল্য ও স্নেহ-মাধুর্যের এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। ■



পাণিহাটির দণ্ড মহোৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গা তীরবর্তী এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ পাণিহাটি। কারও মতে, 'পুণ্যহট্ট' বা 'পণ্যহট্ট' নাম থেকেই 'পাণিহাটি' কথাটি এসেছে। একদা গঙ্গা তীরবর্তী এই অঞ্চলে পণ্য আমদানি রপ্তানি হতো বলেই 'পণ্যহট্ট' নামটি প্রচলিত ছিল। এই জনপদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে গৌড় যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাণিহাটি গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল পাণিহাটি। গঙ্গার তীরে সেই ঘাটটি 'শ্রীচৈতন্য ঘাট' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। শোনা যায়, ১১০২ বঙ্গাব্দে রাজা বল্লাল সেন এই ঘাট তৈরি করেছিলেন। ঘাটের ঠিক উপরেই আছে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ। কথিত আছে, এই বটবৃক্ষের নীচেই চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। পাণিহাটিতে কয়েকদিন অবস্থান করার পরে নীলাচলে যাওয়ার আগে চৈতন্যদেব প্রভু নিত্যানন্দকে দক্ষিণ বাঙ্গলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত্যানন্দ একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাতীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে নামকীর্তন করতে করতে পাণিহাটির 'শ্রীচৈতন্য ঘাট'-এ নামলেন। সেই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভক্তিপ্রাণ ভাইপো রঘুনাথ মজুমদার ওই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করার জন্য রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। সেই সঙ্গে রঘুনাথ সবিনয়ে বলেন, এত দেরি করে কৃপাপ্রার্থী হতে এসেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের কাছে এই স্বীকৃত অপরাধের জন্য দণ্ড বা শাস্তি প্রার্থনা করেন। বিনয়ী রঘুনাথের মুখে একথা শুনে নিত্যানন্দ তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, ''তোমার মতো বিনয়ী বৈষ্ণবের বৈষ্ণব সেবাই দণ্ড। এখানে উপস্থিত বৈষ্ণবদের দই-চিড়ে দিয়ে মহোৎসব করাও। আমি তোমাকে এই দণ্ডই দিলাম''। সেই শুভদিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সেদিন নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ সানন্দে চিড়ে, দই, কলা, দুধ, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। এই উৎসবই বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে 'দণ্ড মহোৎসব' নামে পরিচিত। উৎসবান্তে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।'

তদবধি রঘুনাথ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণব ও ভক্তের সমন্বয়ে এই মহোৎসবের আয়োজন করতেন। রঘুনাথের পর পাণিহাটি নিবাসী রাঘব পণ্ডিত দণ্ড মহোৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পাণিহাটিতে এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। দণ্ড মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ঢল নামে।

'শ্রীচৈতন্য ঘাট'-এর উপর দণ্ড মহোৎসবের প্রাঙ্গণটি বাঁধানো। পাশে একটি ছোটো ঘরে চৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন পূজিত হয়। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, গৌর, নিতাই ও রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহও এখানে রক্ষিত আছে।

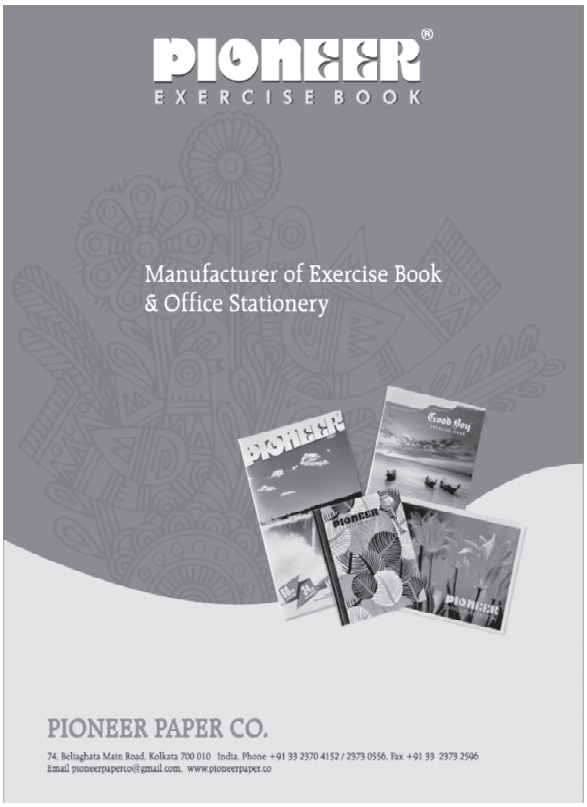
শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ বহুবার দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করেছেন। পাণিহাটি নিবাসী মণিমাধব সেনের কাছে তিনি প্রথম এই উৎসবের বিষয়ে জ্ঞাত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করতে পাণিহাটিতে প্রথম আসেন ইংরেজি ১৮৬৮ সালে। ১৮৮৫ সালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার এসেছিলেন পাণিহাটির মহোৎসবে। এই উৎসবে উপস্থিত থেকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতেন। পাণিহাটির দণ্ড মহোৎসব বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এক মহামিলন মেলা। লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণ মাতানো কীর্তনে মেতে ওঠে মহোৎসব প্রাঙ্গণ। বহু বিদেশি ভক্ত দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করে উৎসবের কৌলীন্য বৃদ্ধি করেন। এবছর দণ্ড মহোৎসব উদ্‌যাপিত হবে ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ জুন) শনিবার। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

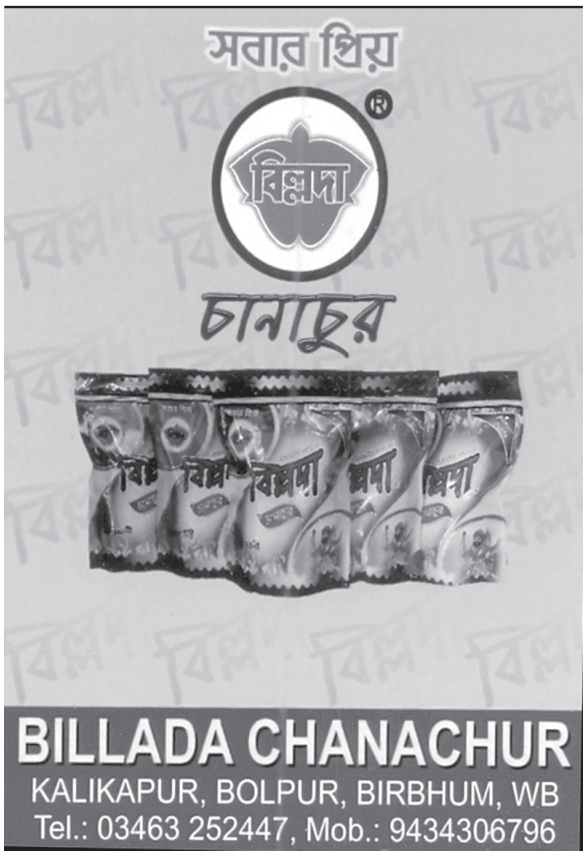
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫





বিজেপির জয়ের নেপথ্য কারিগর

অরুণাভ সেনগুপ্ত

ঘটনাটা পাঁচ বছর আগেকার। ২০১৪ সালে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া মোদীঝড় পশ্চিমবঙ্গে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাত্র দুটি আসন পেয়েছিল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের সবুজ দুর্গ অটুট রাখতে পেরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কার সৌজন্যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিলেন মমতা? উত্তরটা সবাই জানেন। মুকুল রায়। ২০১৭ সালে মুকুল বিজেপিতে যোগ দেন। তাই ২০১৯-এর মোদী ঝড় মমতা সামলাতে পারলেন না। বিজেপি ১৮টি আসনে জয় পেল। আর মমতার দল মুসলমানের মুষ্টিভিক্ষায় ২২টি আসনে জিতে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

একা মুকুলের জন্যেই কি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়জয়কার? অবশ্যই না। নরেন্দ্র মোদী আছেন, অমিত শাহ আছেন— এছাড়া রয়েছেন রাজ্য বিজেপির নেতৃবৃন্দ। কিন্তু মুকুল একটু অন্য ধরনের নেতা। না, ঠিক নেতা হয়তো নন। অসম্ভব দক্ষ একজন স্ট্র্যাটেজিস্ট। তৃণমূলের অন্দরমহলের নক্‌শা যিনি ভালো চেনেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রত্যেক নেতার শক্তি ও দুর্বলতার খোঁজ যিনি সব থেকে ভালো রাখেন। মুকুলের এইসব রাজনৈতিক গুণাবলী বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের নজর এড়ায়নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছিল বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। অমিত শাহ বিশেষ দায়িত্ব দিলেন মুকুল রায়কে। অন্তত ২৩টি আসন চাই। মুকুল তৈরি করলেন স্ট্র্যাটেজি। বাকিটা ইতিহাস।

যুদ্ধে নামার আগে মুকুল দুটো জিনিস জানতেন। তৃণমূল দলে দ্বিতীয় কোনও মুকুল রায় নেই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত বড়ো নেত্রীই হোন, সাংগঠনিক দক্ষতার পরীক্ষায় একশোয় শূন্য পাবেন। বস্তুত তৃণমূলের দলীয় সংগঠনে মুকুলই ছিলেন শেষ কথা। ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তরের নেতা-কর্মীরা তাঁকে চিনতেন। যে কোনও সমস্যায় তার কাছে আসতেন। যে কারণে তৃণমূলের বিখ্যাত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে পেরেছিলেন বলেই মমতা ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিততে পেরেছিলেন।

তাই দায়িত্ব পেয়েই মুকুল তৃণমূলের ঘর ভাঙতে শুরু করেন। নিজের দলের ঘর গোছানো এবং প্রতিপক্ষের ঘর ভাঙা— রাজনীতিতে দুটোই জরুরি। আমরা দেখলাম তৃণমূলের সৌমিত্র খাঁ, নিশীথ প্রামাণিক, অনুপম হাজরা এবং অর্জুন সিংহ বিজেপিতে যোগ দিলেন। এরা সকলেই তৃণমূলি রাজনীতির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। তাই তৃণমূলকে দুর্বল করতে এদের অসুবিধে হয়নি। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুকুল করেছেন। তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমের পায়ের নীচের জমিও ছিনিয়ে নিয়েছেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার সেই ভোট নেমেছে ৮ শতাংশে। ২২ শতাংশ বাম ভোট গেছে বিজেপিতে। যে কারণে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের সম্ভাবনা এখন অনেকটাই নিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক চাঙ্গা করার দুরূহ কাজটি নরেন্দ্র মোদী আগেই করে দিয়েছিলেন। দরকার ছিল এমন একজনের যিনি এই চাঙ্গা ভোটব্যাঙ্ককে ইভিএম পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেন। মুকুল রায় সেই কাজটি করেছেন। অসমে কংগ্রেস থেকে আসা হিমন্তবিশ্ব শর্মা যে কাজটি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে মুকুল রায় ঠিক তাই করেছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাফল্যের মুখ্য কারিগরের শিরোপা মুকুল রায়কে দিতেই হবে। ■

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ ফলাফল

অন্ধ্রপ্রদেশ
মোট আসন ২৫
(রাজ্যে ক্ষমতায় টিডিপি)

তেলুগু দেশম	৩ (১৫)
বিজেপি	০ (২)
ওয়াইএসআর কংগ্রেস	২২(৮)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

অরুণাচল প্রদেশ
মোট আসন ২
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	২ (১)
কংগ্রেস	০ (১)
অন্যান্য	০ (০)

অসম
মোট আসন ১৪
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	৯ (৭)
কংগ্রেস	৩ (৩)
এআইইউডিএফ	১ (৩)
এজিপি	০ (০)
বিপিএফ	০ (০)
অন্যান্য	১ (০)

বিহার
মোট আসন ৪০
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি জোট)

বিজেপি	১৭ (২২)
এলজেপি	৬ (৬)
আরএলএসপি	০ (৩)
আরজেডি	০ (৪)
কংগ্রেস	১ (২)
এনসিপি	০ (১)
জেডিইউ	১৬ (২)
অন্যান্য	০ (০)

ছত্তিসগঢ়
মোট আসন ১১
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস)

বিজেপি	৯ (১০)
কংগ্রেস	২ (১)
বিএসপি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

দিল্লি
মোট আসন ৭
(রাজ্যে ক্ষমতায় আপ)

বিজেপি	৭ (৭)
আপ	০ (০)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

গোয়া
মোট আসন ২
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি জোট)

বিজেপি	১ (২)
কংগ্রেস	১ (০)
অন্যান্য	০ (০)

গুজরাট
মোট আসন ২৬
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	২৬ (২৬)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

হরিয়ানা
মোট আসন ১০
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	১০ (৭)
আইএনএলডি	০ (২)
কংগ্রেস	০ (১)
এইচজেসি(বিএল)	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

হিমাচল প্রদেশ
মোট আসন ৪
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	৪ (৪)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

জম্মু-কাশ্মীর
মোট আসন ৬
(রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন)

বিজেপি	৩ (৩)
পিডিপি	০ (৩)
কংগ্রেস	০ (০)
জেকেএনসি	৩ (০)
অন্যান্য	০ (০)

ঝাড়খণ্ড
মোট আসন ১৪
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	১১ (১২)
জেএমএম	১ (২)
কংগ্রেস	১ (০)
আজসু	১ (০)
জেভিএম(পি)	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

কর্ণাটক
মোট আসন ২৮
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস+ জেডিএস)

বিজেপি	২৫ (১৭)
কংগ্রেস	১ (৯)
জেডিএস	১ (২)
অন্যান্য	১ (০)

কেরল
মোট আসন ২০
(রাজ্যে ক্ষমতায় এলডিএফ)

কংগ্রেস	১৫ (৮)
সিপিএম	১ (৫)
আইইউএমএল	২ (২)
সিপিআই	০ (১)
আরএসপি	১ (১)
কেরল কংগ্রেস (এম)	১ (১)
অন্যান্য	০ (২)

মধ্যপ্রদেশ
মোট আসন ২৯
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস)

বিজেপি	২৮ (২৭)
কংগ্রেস	১ (২)
বিএসপি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

মহারাষ্ট্র
মোট আসন ৪৮
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি+ শিবসেনা)

বিজেপি	২৩ (২৩)
শিবসেনা	১৮ (১৮)
এনসিপি	৪ (৪)
কংগ্রেস	১ (২)
এসডব্লিউপি	০ (১)
অন্যান্য	২ (০)

মণিপুর
মোট আসন ২
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

কংগ্রেস	০ (২)
এনপিএফ	১ (০)
বিজেপি	১ (০)
অন্যান্য	০ (০)

মেঘালয়
মোট আসন ২
(রাজ্যে ক্ষমতায় এনপিপি+ বিজেপি)

কংগ্রেস	১ (১)
এনপিপি	১ (১)
বিজেপি	০ (০)
ইউডিপি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

মিজোরাম
মোট আসন ১
(রাজ্যে ক্ষমতায় এমএনএফ)

কংগ্রেস	০ (১)
এমএনএফ	১ (০)
অন্যান্য	০ (০)

নাগাল্যান্ড
মোট আসন ১
(রাজ্যে ক্ষমতায় এনডিপিপি+ বিজেপি)

এনডিপিপি	১ (১)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

ওড়িশা
মোট আসন ২১
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেডি)

বিজেডি	১২ (২০)
বিজেপি	৮ (১)
কংগ্রেস	১ (০)
অন্যান্য	০ (০)

পঞ্জাব
মোট আসন ১৩
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস)

শিরোমণি অকালি দল	২ (৪)
আপ	১ (৪)
কংগ্রেস	৮ (৩)
বিজেপি	২ (২)
অন্যান্য	০ (০)

রাজস্থান
মোট আসন ২৫
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস)

বিজেপি	২৪ (২৫)
কংগ্রেস	০ (০)



অন্যান্য	১ (০)

সিকিম
মোট আসন ১
(রাজ্যে ক্ষমতায় এসডিএফ)

এসডিএফ	০ (১)
বিজেপি	০ (০)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	১ (০)

তামিলনাড়ু*
মোট আসন ৩৯
(রাজ্যে ক্ষমতায় এডিএমকে)

এডিএমকে	১ (৩৭)
বিজেপি	০ (১)
ডিএমকে	২৩ (০)
কংগেস	৮ (০)
অন্যান্য	৬ (১)

তেলেঙ্গানা
মোট আসন ১৭
(রাজ্যে ক্ষমতায় টিআরএস)

টিআরএস	৯ (১১)
কংগ্রেস	৩ (২)
বিজেপি	৪ (১)
টিডিপি	০ (১)
ওয়াইএসআর কংগ্রেস	০ (১)
এআইএমআইএম	১ (১)
অন্যান্য	(০)

(২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে সময় তেলঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়নি। নতুন রাজ্যের নিরিখে ফল ভাগ করা হয়েছে।)

ত্রিপুরা
মোট আসন ২
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

সিপিএম	০ (২)
কংগ্রেস	০ (০)
বিজেপি	২ (০)
অন্যান্য	(০)

উত্তরপ্রদেশ
মোট আসন ৮০
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	৬২ (৭১)
সমাজবাদী পার্টি	৫ (৫)
কংগ্রেস	১ (২)
আপনা দল	২ (২)
বহুজন সমাজ পার্টি	১০ (০)
আরএলডি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

উত্তরাখণ্ড
মোট আসন ৫
(রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি)

বিজেপি	৫ (৫)
কংগ্রেস	০ (০)
বিএসপি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

পশ্চিমবঙ্গ
মোট আসন ৪২
(রাজ্যে ক্ষমতায় তৃণমল)

তৃণমূল	২২ (৩৪)
কংগ্রেস	২ (৪)
বিজেপি	১৮ (২)
বামফ্রন্ট	০ (২)

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
মোট আসন ১
(কেন্দ্র শাসিত)

বিজেপি	০ (০)
কংগ্রেস	১ (০)
অন্যান্য	০ (০)

চণ্ডীগড়
মোট আসন ১
(কেন্দ্র শাসিত)

বিজেপি	১ (১)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

দাদরা-নগরহাভেলি
মোট আসন ১
(কেন্দ্র শাসিত)

বিজেপি	০ (১)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	১ (০)

দমন-দিউ
মোট আসন ১
(কেন্দ্র শাসিত)

বিজেপি	১ (১)
কংগ্রেস	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

লক্ষদ্বীপ
মোট আসন ১
(কেন্দ্র শাসিত)

এনসিপি	১ (১)
কংগ্রেস	০ (০)
বিজেপি	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

পুদুচেরি
মোট আসন ১
(রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস)

এআইএনআরসি	০ (১)
কংগ্রেস	১ (০)
এডিএমকে	০ (০)
ডিএমকে	০ (০)
অন্যান্য	০ (০)

□ বন্ধনীতে গত বারের ফল।
* একটি কেন্দ্রে ভোট হয়নি।

‘রং দে মোহে কেসরিয়া’

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

‘রং দে মোহে কেসরিয়া’ হ্যাঁ, ২৩ মে’র অপরাহ্ন বেলায় এই কেসরিয়া অর্থে গেরুয়া রঙের আস্তরণেই যেন ঢেকে যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে মফস্‌সল শহরগুলি। রাজনৈতিক পরিসরে বাঙ্গালি ব্যতিক্রম ছাড়া লাল বা সবুজ রঙেই আনন্দোল্লাস প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। বিকেলের দিক থেকেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল লোকসভা নির্বাচনে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির অবিসংবাদিত প্রত্যাবর্তনের খবর। পশ্চিমাকাশে তখন গেরুয়া রঙের সূর্য তাঁর অস্তাচল যাত্রায় সঙ্গী করে নিচ্ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির কিছু পুঞ্জীভূত ক্লেদ। ভারত-পুরুষ নরেন্দ্র মোদীর বিজয়যাত্রা পথে পতন হচ্ছিল বংশবাদ, জাতিবাদ বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর তোষণবাদীদের।

ক’দিন আগেই বুথ ফেরত সমীক্ষায় প্রায় মতৈক্যের সুরেই বিজেপি’র সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন সমস্ত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। মনগড়া গালিগালাজ, ইভিএম কারসাজি-সহ দেশের সমস্ত সম্মাননীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাগাড়ে হেয় করে (সুপ্রিম কোর্টের আদেশ থেকে নির্বাচন কমিশনের আচরণ— এর মধ্যে কিছুই বাদ পড়েনি) তাঁরা নির্বাচনী পরিমণ্ডলটিকে আগে থেকেই এমন ঘিনঘিনে ও অরাজক করে তুলেছিলেন যাতে মনে হতে পারে নরেন্দ্র মোদীর সরকার যেন জোচ্চোরের সরকার। তারা ৫ বছর মেয়াদের শর্তে দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেনি। একটি কুৎসিত অপবাদ ততোধিক কুরুচিকর ভাবে জনতার মধ্যে চারিয়ে দেওয়ার ভ্রান্ত সাফল্যকে সঠিক মনে করে টগবগে হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তানপন্থী কংগ্রেসের চিরশিশু নেতা রাহুল গান্ধী। আমাদের এখানেও গালিগালাজে দড় জননেত্রী, এমন আকর্ষক খেউড় সহজেই তুলে নিয়ে নিজস্ব ব্রান্ডের সঙ্গে পাঞ্চ করে পরের দিকের সভাগুলিতে প্রয়োগ করতে থাকেন। চটুল গালিগালাজ গড়পড়তা মানুষকে হয়তো সহজেই সাময়িক আমোদ দেয়। বিশেষ করে তা যদি সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীদের মুখ থেকে আসে। কিন্তু ভারতের দিনে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করা দেশমগ্ন প্রধানমন্ত্রী ‘চোর’ —এ কথাটি যে সাধারণ মানুষের বুকে ধাক্কা দিয়েছে এই সহজ সত্যটি বোঝেননি প্রধানমন্ত্রী পদলোভী নেতৃকুল। এ প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী আবার ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর কিছুটা অপ্রত্যাশিত হেরে যাওয়ার পর মাত্র ১৪৫ জনকে নিয়ে ফাঁকতালে কংগ্রেস সরকার গঠনের কথা তুলে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেননি যে সেবার দায়িত্বহীন ক্ষমতার স্বাদ পেতে তাঁর পাশে এসেছিল ৬৪ জনের বামবাহিনী। তাদের সাজানো বাগান এখন শুকনো। মৃত বিপ্লবের পথিকেরা অবসৃত। ডিএমকে-র কৃপায় এমন তাঁরা ৫। বাঙ্গলায় শূন্য।

তাজ্জব বনে যাওয়ার কথা যে, শূন্য আসনের অধিকারী উত্তরপ্রদেশের দলিত নেত্রী এক বিষম-জোটের সঙ্গী হয়ে বিভোর হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নে। নরেন্দ্র মোদীকে জাতি তুলে গালি দিলেন। বললেন মোদী জালি নিম্নবর্গীয়। সন্ধ্যে ৬টায় তাঁর সাংসদ সংখ্যা তখনও ২ অঙ্কে পৌঁছায়নি। দলিত শোষক, কোটি কোটি টাকার নোটের মালা পরতে অভ্যস্ত এই বিলাসী নেত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নে তখনই পাকাপাকিভাবে বালি পড়ে গেল এটা ধরে নেওয়া যায়, কেননা তাঁর বয়স এখন ৬৪। এই রে, নরেন্দ্র মোদী তো এই বয়সেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন!

বিগত সংসদে শুধু মাত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৫ জন সাংসদ রেখে ভারতের মতো সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের পরিসরকে কালিমা লিপ্ত করার বিরল গ্লানির অধিকারী মুসলমান তোষক সমাজবাদী দল। তাঁদের বউমা ডিম্পল, দুই ভাই-ভাতিজা ধর্মেন্দ্র আর অক্ষয় ততক্ষণে বিজেপির কাছে পর্যদুস্ত হয়ে পারিবারিক সম্পত্তিসম সংসদে প্রবেশাধিকার হারিয়েছেন। মোদীজী তাঁর বক্তৃতায় বার বার আম্বেদকর উদ্ধৃত করে বলেছেন গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো শত্রু বংশবাদ। এই নির্বাচনে কোনো কোনো দলে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক পরিবারের লোক থাকতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র রক্তের অধিকারে দুর্নীতিগ্রস্ত বংশবাদী প্রতিভূ হরিয়ানার হুডা পরিবার, বংশবাদের দিকপাল— জেলবন্দি লালুর কন্যা মিসা, জেলবন্দি চৌতালা পরিবার, চরণ সিংহের পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ৮৭ বছর বয়সে আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার



লালসা যিনি সংবরণ করতে পারেন না সেই দেবেগৌড়াও কর্ণাটকের টুঙ্কুর ও মাণ্ড্য কেন্দ্রে প্রপৌত্র-সহ ভারতে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নরেন্দ্র মোদীর রথ চক্রে নির্বাচনী বলি হয়েছেন। এঁরা বিধানসভা, সংসদ এগুলিকে জায়গির বানিয়ে ছিলেন। এই ঐতিহাসিক নির্বাচন তাই নৈতিক উত্তরণেরই সাফল্য।

প্রধানমন্ত্রিত্বের 'সামিটে' পৌঁছতে আমাদের বাঙ্গলাতে রচিত হচ্ছিল ৪২-এ ৪২-এর দাপুটে ছক। অন্তত ৩৫ পেলেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়া যাবে। তখন বাকি আট আনা চার আনা, আনি দু' আনি সকলকে জুটিয়ে বিজেপির জুজু দেখিয়ে কংগ্রেসকে (ধরে নিয়েছিলেন ১০০ অন্তত পাবে) দাবড়ে বাধ্য করবেন সমর্থন দিতে। বিহারের দিকে একটা চলতি কথা আছে 'ঘর ঘোটালা চাচা'র (যিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ রাখেন, কখনও কেলেঙ্কারি ফাঁস করেন। সদা ব্যস্ত থাকেন) ভূমিকায় নেমেছিলেন অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু। সাড়ে চার বছর কেন্দ্রে ক্ষমতার মধু খেয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াইএসআর-এর জগন রেড্ডি বিপুল জনপ্রিয় হয়ে পড়ায় ভয়ে জোট ভেঙ্গে রাজ্যে ফেরেন। যাতে অন্ধ্র দরদি সেখানো যাবে, আবার 'ঘর ঘোটালা চাচা' হয়ে কেন্দ্রে মনোমতো লোক বসিয়ে মালাইও বের করে নেওয়া যাবে। কী করেননি? একবার দিল্লি তো একবার শরদ পাওয়ারের বাড়ি। সেখানে নাকি Common Minimum Programme-এর খসড়াও লেখা হচ্ছিল। কখনও বাঙ্গালোরে কুমারস্বামীর চোখের জল মোচ্ছাচ্ছেন, আবার কলকাতায় দিদির সভায় ২১ দলের নেতাদের হাত তোলার (উদ্বাহু) ব্যায়াম শেখাচ্ছেন। ২১ তারিখে ভোর রাতে কালীঘাটে এসে ধরনা দিয়েছিলেন। এঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ভয়ংকর গম্ভীর--- দেশরক্ষা, সংবিধান বাঁচানো, মোদীর হাত থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রভৃতি। দেশের মুখ্যু জনগণ কিন্তু এঁদের মতলব ধরে ফেলেছিল। চন্দ্রবাবুর টিডিপি সংসদে ১৫ আসন থেকে ৩-এ নেমে এসেছে। রাজ্যে ২৪ আসন পেয়ে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। উঠে এসেছেন নবীন প্রজন্মের ৩৫০০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে অন্ধ্রবাসীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করা মিতবাক জগন রেড্ডি। লোকসভায় ২২টি আসন তাঁর। ইনি কিন্তু রাজনীতিক বাবার ছেলে হয়েও জেলবাস করে, মিথ্যে মামলায় ফেঁসে নিজেকে তুলে এনেছেন। সন্ধ্যে ঘন হয়ে এসেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী উত্তাল বিজেপি কার্যকর্তাদের সম্বোধন করবেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। এখানেও আলাউদ্দিন খিলজির দুর্গ পতনোন্মুখ। চুরমার হয়ে গেছে কুস্বপ্ন। অপরিচিত রং গেরুয়া গায়ে মাখছে বাঙ্গলার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষজন। বিজেপি অবিশ্বাস্য ফল করে ১৮টি আসন পেয়েছে যা বিধানসভার নিরিখে ১৫০টি।



এই নির্বাচন মিথ্যের মিনার ও জনগণের সঙ্গে ছলনাকে বরাবরের মতো ধ্বস্ত করে দেওয়ায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিল্লিতে ইতিমধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। নিখোঁজ হয়ে গেছেন 'ঘর ঘোটালা চাচা'। খবর এসেছে তাঁর বহু বহু কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক-ছেলে লোকেশ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। কর্ণাটকে, উত্তরপ্রদেশে, বিহারে জাতপাত নিকেশ হয়ে গেছে। মোদীজী তাঁর ভাষণে বলেছেন— ''দেশের মানুষ একটি দায়বদ্ধ দৃঢ়সংকল্প বিশ্বস্ত সরকার চায় যে তার মঙ্গলের জন্য কাজ করবে। কদাচ নিজের জন্য নয়। তিনি তাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যে কেজরিওয়াল-সহ (ইনি নাকি ৫ জন প্রধানমন্ত্রীর ফরমূলা দিয়েছিলেন।) পূর্বোল্লেখিত প্রধানমন্ত্রিত্বের অনেক নিখোঁজ দাবিদারের নামে এফ আই আর করা হয়েছে। জনতা ফুরফুরে মনে গাইছে 'রং দে মোহে কেসরিয়া'। ▮

বিরোধীরা স্বর্গত, ওঁদের আত্মার শান্তি কামনা করুন

সৃজিত রায়

বাংলা ননসেন্স সাহিত্যে সুকুমার রায়ের একটি অনবদ্য সংযোজন হলো হ য ব র ল। ভারতবর্ষের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হতেই বুথ ফেরত সমীক্ষায় হার সুনিশ্চিত বুঝে গিয়েই মোদী বিরোধী চুনোপুঁটি আঞ্চলিক দলগুলি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন আর ভিভি প্যাট নিয়ে সে আচরণ দেখাল তাতে হযবরল-র দুটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে গেল। প্রথমটি হলো হিজবিজবিজ। যাকে নাম জিজ্ঞাসা করলে সে অকাতরে বলে যেত, আমার নাম হিজবিজবিজ। আমার ভাইয়ের নাম হিজবিজবিজ। আমার পিসের নাম হিজবিজবিজ... ইত্যাদি। দ্বিতীয় চরিত্রটা হলো কাকেশ্বর কুচকুচে যে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করত— সাত দু'গুণে কত হয়। তারপর গাল ফুলিয়ে উত্তর দিত— সাত দুগুণে চোদ্দর চার হাতে রইল পেনসিল।

যে দলগুলির অস্তিত্ব টিকে আছে দু'চারটি সাংসদ আসনের মধ্যে, যাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ে ল্যাজ নাড়ানোর সুযোগই নেই, তাদের হাতে এখন ওই কাকেশ্বর কুচকুচের মতো 'হাতে পেনসিল' অবস্থা। রাফায়েল, পুলওয়ামা থেকে হাজারো অস্ত্র ব্যবহার করেও মোদী নামক ব্রহ্মাস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রাগ উপড়ে দিতে শুরু করেছে ইভিএম আর ভিভি প্যাটের ওপর। তার কী হাস্যকর প্রস্তাব— ভিভি প্যাটের সব স্লিপ গুনতে হবে। ইভিএম নাকি ট্যাম্পারিং হয়েছে।

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। কিংবা সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁটে শালাকে ধর। প্রবাদবাক্যগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ দেখিয়ে চুনোপুঁটিরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন--- তাঁরা হেরেছেন বাস্তববোধের অভাব থেকে। ভবিষ্যতেও হারবেন মতিভ্রমের কারণেই।

ভারতবর্ষে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ১৯৮২ সালে কেরলের পারাভুর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপনির্বাচনে। এটা ছিল অনেকটাই পরীক্ষামূলক। পরে ১৯৮৯ থেকে বৃহৎ সংখ্যায় ইভিএম ব্যবহার শুরু হয় স্বচ্ছ ভোটদানের তাগিদেই। কারণ ইভিএম চালু হওয়ার পর ব্যালট পেপারে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার যে বৃহত্তর চক্রান্ত রাজ্যে রাজ্যে রাজ করে বেড়াত, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। ছোটো ছোটো রাজ্যভিত্তিক শক্তিগুলি সেদিনই বুঝে গিয়েছিল— ছাপ্পা ভোটের যুগ শেষ। তাই প্রায় প্রতিটা নির্বাচনের আগেই ইভিএমকে ভিলেন সাজানোর চেষ্টা করেছে আঞ্চলিক দলগুলি। তারপর ভোটের ফলাফলে যখন জিতেছেন, মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আর হারলেই চিৎকার করে গগন ফাটিয়েছেন যে সায়েন্টিফিক রিগিং হয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মনোবিদরা বলেন, মানুষ যখন ব্যর্থতার সাগরে হাবুডুবু খায়, তখন সে ঘুমের মধ্যে নানা দুঃস্বপ্ন দেখে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এমন সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি (২/৪টি দল ছাড়া) হতাশাজাত দুঃস্বপ্নের শিকার হয়েই হযবরল-র হিজবিজবিজের মতো আচরণ করেছে। ভুলভাল বকে ভোটারদের কাছে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছে আর অদূর ভবিষ্যতে কোমর সোজা করে দাঁড়াবার মতো শক্তিটাও বৃথাই ব্যয় করেছে। এই বিরোধী দলগুলিই ২০১৮-য় রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএমের বদলে ব্যালটে ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। তিনটি বিধানসভাতেই জেতার পর আর কেউ রা কাড়েনি।

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন আসলে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যা পুরোপুরি ওয়েব-লিঙ্ক বহির্ভূত। এই মেশিনগুলি তৈরি হয় বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের তত্ত্বাবধানে রাজ্যে রাজ্যেই এবং তা মজুতও করা হয় রাজ্য স্তরেই। ভোটের প্রার্থীদের নামগুলি যুক্ত হয় প্রার্থীপদ জমা পড়ার পর। তার আগে নয়। সুতরাং ইভিএম আগেভাগে কারচুপির তত্ত্বটা একটা অলীক কল্পনা মাত্র। কারণ প্রার্থীদের নামের তালিকা থাকে নামের আদ্যক্ষরের ভিতিতে ক্রমানুযায়ী। সেক্ষেত্রে তাহলে প্রতিটি মেশিনে আলাদা ভাবে কারচুপি করতে হয় যা একেবারেই অসম্ভব। নামের তালিকা আদ্যক্ষরের ক্রমানুযায়ী লাগানোর পরই প্রতিটি মেশিন সিল করে দেওয়া হয়। সেই সিল খোলা হয় নির্বাচনী বুথে ভোট নেবার সময়। যা করা হয় সব রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের সামনে। তারপর হয় মক টেস্ট যা নিশ্চিত করে মেশিনের কার্যকারিতা।

ভারতীয় রাজনীতিতে ওই বিরোধীরা এখন স্বর্গত, প্রয়াত। প্রয়াত মানুষের ওপর রাগ পুষে রাখবেন না। মৃতের সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। অতএব ওদের সব বিরোধিতা, সব মুর্খামি, সব ঔদ্ধত্য, সব হাস্যকর আচরণ ভুলে গিয়ে ওঁদের আত্মার শান্তি কামনা করুন।



নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে প্রার্থীদের এজেন্টদের সামনেই মেশিনগুলি পুনরায় সিল করা হয়। তারপর তা পাঠানো হয় স্ট্রংরুমে যা সংরক্ষিত থাকে কড়া পুলিশি প্রহরায়। স্ট্রংরুম থাকে সম্পূর্ণ ভাবে তালাবন্দি। এমনকী তালার কি-হোলটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুনরায় মেশিনগুলি প্রকাশ্যে খোলা হয় ভোট গণনার দিন। এবার ভোটে ভিভি প্যাট ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটার দেখে নিতে পেরেছেন, তাঁর ভোট সঠিক প্রার্থীপদে পড়ল কিনা। তারপরেও বিরোধীদের সন্দেহ প্রকাশ ভিমরতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোদীকে শায়েস্তা করতে না পেরে বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। এও এক অবান্তর প্রচেষ্টা। কারণ ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে তুলেছেন ভারতের এ যাবৎ সবচেয়ে দৃঢ়মনা সৎ চরিত্রের নমুনা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী যিনি তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গড়ে ছিলেন দুর্নীতি থেকে নির্বাচন কমিশনকে মুক্ত করতেই। এবার শক্তসমর্থ নির্বাচন কমিশন যখন স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে, তখনই গোঁসা হয়েছে ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলির। কারণ ভোটবাজারে করে খাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মোদীর যোগসাজস! 'বলবেন না কত্তা। বেড়ালে হাসব।' মনে রাখা দরকার, নির্বাচন চলাকালীন সবচেয়ে বেশি টাকা নির্বাচন কমিশন উদ্ধার করেছে বিজেপির কাছ থেকেই। এই নির্বাচন কমিশনই বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে একটি লোকসভা কেন্দ্রের ১৫ শতাংশ বুথে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন। যদি সত্যিই মোদী-ভালোবাসায় নির্বাচন কমিশন আপ্লুত হতেন, তাহলে কি এমন বিজেপি বিরোধী পদক্ষেপ নিতেন?

মনে আছে গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা? যেখানে গোরু হারিয়ে গোপাল নিজের বউকেও মা বলে ডেকে ফেলায় কৈফিয়ত দিয়েছিলেন— গোরু হারালে এমনই হয় গো! বিরোধীরা এখন সব গোরু হারিয়ে ছন্নছাড়া। অতএব আগামী কয়েকমাস তাঁরা ভুলভাল বকবেন। তারপর যখন দেখবেন, হালে পানি পাচ্ছেন না, নিজেরাই খোলসের মধ্যে শীতঘুমে চলে যাবেন সাপের মতো।

প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম হযবরল-র গল্প দিয়ে। শেষও করি তাহলে ওই হযবরল দিয়েই। কারণ বিরোধীদের ভোট পরবর্তী আচরণে হযবরল-র চেয়ে ভালো অনুষঙ্গ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

সেই বেড়ালছানাটার কথা মনে করুন, যে রুমাল থেকে বেড়ালে রূপান্তর হয়েছিল আর তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে পায়ের থাবা চাটতে চাটতে বলেছিল— বেড়ালও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো। আবার চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো। ভোটের ফলাফল মোদী বিরোধীদের নামের আগে একটা করে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে ওই বিরোধীরা এখন স্বর্গত, প্রয়াত। প্রয়াত মানুষের ওপর রাগ পুষে রাখবেন না। মৃতের সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। অতএব ওদের সব বিরোধিতা, সব মূর্খামি, সব ঔদ্ধত্য, সব হাস্যকর আচরণ ভুলে গিয়ে ওঁদের আত্মার শান্তি কামনা করুন। ▮

ভক্ত প্রহ্লাদ থেকে জটায়ু সব চরিত্রেই মানানসই বিভু ভট্টাচার্য



রূপশ্রী দত্ত

বাংলা চলচ্চিত্রের শিশুশিল্পী বলতে এক ডাকেই লোকে যাকে চেনে, তার নাম শ্রীমান বিভু ভট্টাচার্য। যার পরিচিতি ছিল মাস্টার বিভু অথবা শ্রীমান বিভু নামে।

বিভুর জন্ম হয়েছিল বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে, এখন যা ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত। তার জন্ম হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

তিনি কোনওদিন প্রথাগতভাবে স্কুলে যাননি। মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে তিনি মর্যাদা ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় আরম্ভ করেন ১৯৪৯ সালে। তাতে উত্তমকুমারও অভিনয় করেছিলেন। বর্ষীয়ান পার্শ্বচরিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালকে সহ-শিল্পী হিসেবে পেলে বিভুর অভিনয় আরও দর্শনীয় হয়ে উঠত।

তার প্রথম দুটি ছবি পুরাণভিত্তিক 'প্রহ্লাদ (১৯৫২) তারপর 'ধ্রুব' (১৯৫৩)। দুটি ছবিতেই তার অভিনয় ছিল নাম ভূমিকায়। এরপর 'রাণী রাসমণি' (১৯৫৫) ও দুই বোন (১৯৫৫)। এর আগে তার অভিনীত ছবি ছিল 'বিন্দুর ছেলে' (১৯৫২)। শেষের দুটি ছবি পারিবারিক ও সামাজিক। 'বিন্দুর ছেলে'তে, বিন্দুর বড়জায়ের ছেলে অমূল্যর ভূমিকায় তার অভিনয় সকলেরই মন কেড়েছিল। নিঃসন্তান বিন্দু অমূল্যকেই মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করত। শিশুশিল্পী হিসেবে তার শেষ ছবি 'সাগর সঙ্গমে' (১৯৫৯)। তারপর সুদীর্ঘ ৩৯ বছরের বিরতি। এই সময়টা অবশ্য তিনি নাটক ও টিভি সিরিয়াল করেছেন।

১৯৯৮ সালে তিনি চলচ্চিত্রে ফিরে এসেছিলেন তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত 'জটায়ু' চরিত্রে। সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' ছবির জটায়ু চরিত্র তাঁর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ছবি। এরপর তিনি পাকাপাকি ভাবে ফেলুদা সিরিজের জটায়ুর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' মুক্তিলাভ করে ১৯৯৯ সালে। তারপর 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' (২০০৩), 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' (২০০৭), 'টিনটোরেটোর যীশু' (২০০৭), 'গোরস্থানে সাবধান (২০১০) এবং 'রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য (২০১১), জটায়ু চরিত্রের যথাযথ রূপদানে বিভু তার স্বভাবগত ভাবেই সার্থক হয়েছিলেন। সত্যজিৎ-পুত্র পরিচালক সন্দীপ রায়ও সঠিক ভূমিকায়, সঠিক অভিনেতাকে নির্বাচন করে খুশি হয়েছিলেন।

শৈশবে লাবণ্যময়, ঝুঁটি করে বাঁধা চুল বিভু-কে তৎকালীন দর্শকরা— আজকের বয়োবৃদ্ধেরা ভুলতে পারেননি। ক্ষীণকায় যে পুস্তিকা তখন হলে বিক্রি হতো, তার প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত বিভুর ধ্রুব বা 'প্রহ্লাদ'-এর ছবি যেন পুরাণের পাতা থেকে উঠে আসা বর্ণনার অনুরূপ। কৃষ্ণের প্রতি ভক্ত ধ্রুব বা ভক্ত প্রহ্লাদের যে আর্তি, তা বিভুর কণ্ঠে মর্মস্পর্শী হয়ে ধরা দিয়েছিল। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ প্রতিটি শব্দের স্পষ্টতা তাকে আরও অনুভববেদ্য করে তুলেছিল। 'পদ্মপলাশলোচন হরি, একবার দেখা দাও' —সংস্কৃত মন্ত্রও অপূর্ব দক্ষতায় বিভু উচ্চারণ করত। তৎকালীন দর্শকেরা মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যেতেন। আবার পারিবারিক ছবি 'বিন্দুর ছেলে'তে অমূল্যর ভূমিকায় বালক বিভুর ধুতি ও হাফশার্ট পরা চেহারাও দর্শককে খুশি করেছিল।

সেইসঙ্গে মর্মস্পর্শী অভিনয়ও। বিভুর তিরোধানের পর জটায়ু চরিত্রের শূন্যস্থান কীভাবে পরবর্তী ফেলুদাতে পূর্ণ হবে, তা সন্দীপ রায়কে গভীর চিন্তায় ফেলেছিল। অনেক অভিভাবকই চান না তাঁদের সন্তানরা অভিনয়শিল্পী হোক। কারণ ওই পরিমণ্ডলে একবার এলে যথাসময়ে বেরিয়ে এসে পাঠে মনোনিবেশ করা বেশ দুরূহ কাজ।

বিভু কিন্তু সঠিক সময়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। খ্যাতির মধ্যগগনে থেকেও ওই পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে অনুশীলন ও চর্চা দ্বারা আরও যথাযথভাবে অভিনয়শিল্পকে সমৃদ্ধ করা ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য বিভুর মধ্যবর্তী সময়ের অন্তরালবাস নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ▮

এবার নরেন্দ্র মোদীর গৌরবময় ভারতের দিকে যাত্রা

অম্লান কুসুম ঘোষ



বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঝরনাধারা যেন ধুইয়ে দিয়েছে দেশবাসীকে। ভুলিয়ে দিয়েছে তাদের সকল ক্লান্তি সকল বিষাদ। পাঁচবছর পরে সংবিধান অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে। সেই পুনর্মূল্যায়নে এনডিএ জয়ী হয়েছে বিপুল ভাবে। আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক। নির্বাচনী পাটিগণিতে শাসনক্ষমতায় থাকা দলের ভোট কিছুটা হলেও কমে, কিন্তু এবারের নির্বাচন সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। শাসনক্ষমতায় থাকা দলের আসনসংখ্যা ও ভোট দুইই বেড়েছে। এই ব্যতিক্রমী বৃদ্ধির একটাই কারণ এনডিএ-এর জনহিতৈষী কার্যকলাপে দেশবাসী খুশি।

সাধারণ মানুষ খুশি হয়েছে। তাই তো ভোট বাক্সে এই প্রতিফলন। খুশি হয়েছেন সেই মানুষটি এতকাল গৃহহীন থাকার পর মোদী জমানায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যিনি মাথার ওপর ছাদ পেয়েছেন। মুদ্রা যোজনায় ঋণ পেয়ে খুশি হয়েছেন সেই মানুষটি এতকাল পুজির অভাবে যিনি নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেননি। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারা হয়ে ভারতে পালিয়ে আসা সেই মানুষগুলিও এতদিন বাদে দেশের বৈধ নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দে উদ্বাহু হয়ে ভোট দিয়েছেন বিজেপির ঝুলিতে। আবার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়মিত অত্যাচারে জর্জরিত সীমান্ত এলাকার আতঙ্কিত জনসাধারণও তাদের আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন বিজেপির প্রতি। খুশি হয়েছেন সেই দরিদ্র কৃষক যিনি চাষ শুরুর আগে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেয়েছেন সরকারের কাছে। খুশি হয়েছেন সেই মুসলমান মহিলারা এতদিন মধ্যযুগীয় তিন তালাক প্রথার জন্য যাদের জীবন ছিল খেলনার মতো। খুশি হয়েছেন সেই কাশ্মীরি পণ্ডিত যিনি দীর্ঘ তিন দশক পরে ফিরতে পেরেছেন নিজের বাড়িতে। সর্বোপরি খুশি হয়েছেন সেই কোটি কোটি দেশপ্রেমিক ভারতীয় যারা বিদেশের মাটিতে দেশের জয়পতাকা উড্ডীন হতে দেখে গর্বিত বোধ করেন, দেশের শত্রু সন্ত্রাসবাদীরা নিহত হলে যারা নিশ্চিন্ত হন।

যাত্রা শুরু হয়েছে সেই গৌরবময় ভারতের দিকে। সেই যাত্রাকে শেষ করতে হবে। বিরোধীরা নিঃশেষিত, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। এখন শুরু নতুন ভারত গড়ার যুদ্ধ। এখন শুরু দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়াতে হবে, দেশপ্রেমিক মানুষেদের।

শুধুমাত্র দেশময় খুশির পরিবেশ সৃষ্টি করাই নয়, এবারের নির্বাচনী ফলাফল আরও নানা কারণে যুগান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত থাকবে ইতিহাসে।

প্রথমত, স্বাধীনতার পর থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ উত্তরপ্রদেশের ভোটারা এবার জাতপাতভিত্তিক জোটের অঙ্ককে নস্যাৎ করে বিকাশের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। শোষণকারী জাতভিত্তিক নেতাদের বিভেদ ও শাসন উপেক্ষা করে জাতিবিদ্বেষের কানাগলিকে পরিহার করে তারা এবার উন্নয়নের রাজপথকে আপন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সুবিধাবাদী জোট রাজনীতির জাল ছিন্ন করে স্থায়ী সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন দেশের সমস্ত প্রান্তের মানুষ।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন প্রদেশে বিধানসভা আর লোকসভার ভোটে আলাদা দলকে ভোট দিয়ে নিজেদের পরিণত রাজনৈতিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন জনসাধারণ।

সর্বোপরি শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গেও এই নির্বাচনে প্রথমবার দেখা গেল বিজেপির এতখানি আধিপত্য। স্বাধীনতার পর থেকে এতাবৎকাল রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদীদের

ফঃ ৬

অপাংক্তেয় করে রেখে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই সর্বভারতীয় নিরিখে সমস্ত রকম মাপকাঠিতে নিজেকে পেছনের সারিতে নিয়ে ফেলেছিল। আজ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে বিজয়মাল্য দিয়ে বরণ করে সেই ঐতিহাসিক পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত পশ্চিমবঙ্গ করলো। এখন নিঃসংশয়ে এই আশা করাই যায় যে, জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনাধীনে পশ্চিমবঙ্গ নিজের পূর্বগৌরব ফিরে পাবে এবং পুনরায় গোটা দেশের পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করবে।

জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের পরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিই দ্বিতীয় যারা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে পাঁচ বছর সরকার চালানোর পরে পুনরায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। জনসাধারণ ভরসা করেছেন মোদীর ওপর, বিজেপির ওপর। জনগণের অনুগ্রহে সর্বাত্মক ক্ষমতা আজ বিজেপির করায়ত্ত। জনগণের এই ভরসার মর্যাদা রক্ষা করা এখন মোদীর ও বিজেপির দায়িত্ব। পূজার উপাচার দেশবাসী সর্বাত্মকভাবে জোগাড় করে দিয়েছেন। এখন দেশমাতৃকার পূজা সুচারুভাবে সম্পন্ন করা মোদীর ও বিজেপির অবশ্য কর্তব্য।

মোদীর নতুন ভারত গড়ার কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আসমুদ্রহিমাচলের মানুষ। এখন নতুন ভারত গড়ার কাজ শেষ করতে হবে নতুন সরকারকে। প্রথম ইনিংসে অনেক কাজ করেছেন মোদী কিন্তু এখনও বাকি আছে অনেক কাজ। এবার দ্বিতীয় ইনিংসে করতে হবে সেই বাকি কাজগুলো।

বিজেপির হাতে আজ এককভাবে ৩০১ লোকসভা সদস্য। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তারা লাভ করবে। আইনসভায় এই সংখ্যাধিক্যের জোরে এতদিন না করতে পারা অনেক সংস্কার এখন করতে পারবে সরকার। রামমন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ করে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন— এই ত্রিবিধ কাজ তো সম্পন্ন করতে হবেই। এছাড়াও বেশ কিছু কাজকে রাখতে হবে অগ্রাধিকারের তালিকায়।

প্রথমত, দীর্ঘকালের ঘোষিত বাম ও অঘোষিত বাম (তৃণমূল) শাসনে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমান শাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা এখন কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সমগ্র পূর্ব সীমান্ত জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে বিদেশি আগ্রাসন। কখনো অনুপ্রবেশ, কখনো উগ্রপন্থা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্তর্লীন আগ্রাসন চালিয়ে ভারতের এই অংশটিকে নিজের দখলে আনতে মরিয়া বিদেশি শক্তিগুলি। এই কাজ তারা করতে চায় উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন সীমানায় আক্রমণ করে এবং উত্তরবঙ্গকে বিপন্ন করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগের একমাত্র পথটিকেও (উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং নিয়ে গঠিত চিকেনস্ নেক) নিজের অধিকারে এনে। কংগ্রেস আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতায় উত্তর-পূর্ব ভারত জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিনের বাম ও তৃণমূল শাসনে উত্তরবঙ্গও ছিল অবহেলিত। ২০১৪-য় মোদী আসার পর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতি শুরু হয়েছে। এই সুশাসনের ঢেউ চোখে পড়েছে উত্তরবঙ্গবাসীরও। সীমান্তও সুরক্ষিত হয়েছে। এনআরসি-র ফলে স্থানীয় মানুষ পেয়েছেন সুরক্ষার আশ্বাস। ফলে সেখানকার মানুষ এবারে তাদের সমর্থন উজাড় করে দিয়েছেন মোদীজীর প্রতি। এখন মোদীজীর প্রতিদানের পালা। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই অঞ্চলটি হিমালয়ের বরফ গলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারা বছর। পাহাড়ি ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ড গতিতে নিম্নমুখী হয়। ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন বিকল্প শক্তির সন্ধানরত, তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নতি ত্বরান্বিত করে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা ও উত্তরবঙ্গের তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তকে পাকিস্তান সীমান্তের মতো রুদ্ধ করে ও সেনাবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ করাই এখন নতুন সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

তৃতীয়ত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ মোদী সরকার গত পাঁচ বছরে নিয়েছে। কিন্তু দেশ দুর্নীতিমুক্ত এখনো হয়নি। আরও কড়া ও দ্রুত পদক্ষেপ করে দুর্নীতির সম্পূর্ণ মুলোচ্ছেদ করা বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম দিকে থাক উচিত।

চতুর্থত, কর্মসংস্থান বাড়ানো বর্তমান সরকারের অর্থনীতির প্রধান মন্ত্র হওয়া উচিত। বেকারত্ব দূর করে দেশের সব হাতে কাজ দিয়ে দারিদ্র্য নামক শব্দটিকে দেশ থেকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়া আশু প্রয়োজন।

এতাবৎকাল অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে দেশকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিক দিয়ে বিগত সরকারের কাজ খুব একটা আশাপ্রদ নয়। সেই ঘাটতি এবারে পূরণ করা জরুরি।

কাজ এখনও অনেক বাকি। মোদী জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছেন। এবার সিংহতুল্য কার্যের দ্বারা দেশকে জগৎসভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে। নির্মাণ করতে হবে সেই ভারতবর্ষকে যে ভারতবর্ষের প্রতিরূপ ধ্যানাসনে উপলব্ধি করেছিলেন স্বামীজী। যাত্রা শুরু হয়েছে সেই গৌরবময় ভারতের দিকে। সেই যাত্রাকে শেষ করতে হবে। বিরোধীরা নিঃশেষিত, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। এখন শুরু নতুন ভারত গড়ার যুদ্ধ। এখন শুরু দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়াতে হবে, দেশপ্রেমিক মানুষেদের। ■

হাওড়া জেলা আদালত ও আইনজীবীদের আত্মমর্যাদা

আশিস কুমার মোদক

ভারতের অঙ্গ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে আমার চিরকালের গর্ব বঙ্গভূমি। যেখানে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের জন্ম হয়েছে। এই বাঙ্গলা নবজাগরণের পথিকৃৎ। বার বার এই বাঙ্গলা পথ দেখিয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষকে, ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। তাই আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু একটি ঘটনায় সব হিসেব যেন টালমাটাল হয়ে গেল। নগ্ন মানবিকতাই যেন বাঙ্গালিকে একটা বন্ধনীর মধ্যে ফেলে দিল। আপন অধিকার যদি অকারণ খর্ব হয়, তা মেনে নেওয়া মনুষ্য জাতি হিসেবে অবমাননাকর। হাওড়া আদালতের একটি ঘটনা তারই প্রমাণ। দিনটা ২৪ এপ্রিল ২০১৯। হাওড়া জেলা আদালত এবং তার সংলগ্ন হাওড়া করপোরেশন এবং তার অফিস। সেখানে ওকালতি পেশায় যুক্ত উকিল, মুহুরি এদের যাতায়াত সব সময় এবং তা কাজের স্বার্থেই হয়ে থাকে। এতদিন কোনো সমস্যা হয়নি। হাওড়া করপোরেশন অফিসের মধ্যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে পেশাগত কাজে যুক্ত সকলকেই যাতায়াত করতে হয়। এজন্য অনেকেই নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। গাড়ি, বাইক ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে করপোরেশনের চত্বরের মধ্যে এবং এতদিন ধরে সেই নিয়মই চলে এসেছে। একথা ওখানকার মহামান্য মেয়র এবং মহামান্য বিচারপতিও অবগত ছিলেন। কিন্তু গোলযোগের সূত্রপাত হয় হঠাৎ করে শাসক দলের কিছু লোক জোর পূর্বক টাকা আদায়ের চেষ্টা করায়। কিন্তু আইনি পেশায় যুক্ত লোকেরা টাকা দিতে না চাওয়ায় শুরু হয় বচসা, তারপর ধস্তাধস্তি। এভাবেই কিছুক্ষণ চলায় উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ে তা ওখানে কর্তব্যরত পুলিশের সামনে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এতক্ষণ তো একরকম চলছিল কিন্তু হঠাৎ কার নির্দেশে আইনজীবীদের ওপর চলল পুলিশের লাঠি আর অকথ্য গালিগালাজ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে শাসক দলের মদতপুষ্ট লোকজনের হাতে লাঠি আর মুখে অকথ্য ভাষা। মহিলাদের পুরুষ-পুলিশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুলের মুঠি ধরে এবং অশোভনীয়ভাবে গায়ে হাত দিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে। এর মাঝখান থেকেই কোনো একজন পুলিশ বলে উঠল, ''দে না লাঠিটা ঢুকিয়ে''। মেয়েটি বার বার বলছে আমাকে ছেড়ে দিন, প্লিজ গালাগাল দেবেন না। একজন মহিলা পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে বলছে, থামবি না চালিয়ে যা। এরপর পুলিশের উন্মত্ততা আরও বেড়ে গেল। আইনজীবীদের সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশনও উন্মত্ত পুলিশ ঢুকে



বেপোরয়া মারধর শুরু করে দিল। কারও কোনো অনুরোধ তাদের কানে পৌঁছল না। কারণ তারা শাসক দলের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। সেদিন ঘটনার সময় চত্বরে হাজির ছিলেন শাসক দলের এক বিশিষ্ট মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতা। শুধু আইনজীবীদের কর্মস্থলই নয় তারা বিচারপতিদের কক্ষ পর্যন্ত বাদ দেয়নি। বিচারপতি বারবার বলছেন আমি বিচারপতি কিন্তু ওরা কর্ণপাত করেনি। উল্টে তাঁর সঙ্গেও একই আচরণ করেছে। একথা উল্লেখ করতেই হয় যে, কোনো আইনজীবী এমতাবস্থাতেও হাতে কোনো লাঠি বা ঢিল নেয়নি আত্মরক্ষাতে। কারণ তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল। আইনজীবীরা কোনোরকম প্রতিরোধের জায়গায় ছিল না এবং প্রতিরোধের সুযোগও পায়নি। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত পুলিশের উন্মত্ততার শিকার হলো।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা করেন। এখনো পর্যন্ত দু সপ্তাহ অতিক্রান্ত। সরকার পক্ষ থেকে কোনো জবাব দাখিল হয়নি। কারণ জবাব দিতে গেলে সরকার পক্ষের আধিকারিকরা দোষী সাব্যস্ত হবেন। ইচ্ছা থাকলেও ঘটনার বিবরণ মিথ্যা দিতে পারবেন না এই জন্য যে আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের দৌলতে অনেকটাই রেকর্ড করা আছে। কিন্তু অপেক্ষা, সরকার পক্ষ কী করে তা দেখার। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আইনজীবীরা হাওড়ার ঘটনার সুষ্ঠ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সব আদালতে কাজ কর্ম বন্ধ রেখেছেন।

আজ সারা দেশে যখন গেরুয়া ঝড় তার আলোকছটা পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে, সমগ্র সমাজকে আলোড়িত করেছে, তখন স্বার্থান্বেষীরা দেখছে অশনি সংকেত। তাই আটকাতে হবে সব প্রতিবাদ, তা না হলে তাদের স্বপ্নের কারবার ধন হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ফিরে যেতে হতে পারে পূর্বাস্থায়, তাই যেন তেন উপায়ে ভেঙে দাও সব প্রতিরোধ প্রতিবাদ। আইনজীবীরা বদ্ধপরিকর থেকে তাদের আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে।

পাকিস্তানের শতাব্দী প্রাচীন গুরুনানক সৌধ গুঁড়িয়ে দিল জেহাদিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লাহোর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে নারওয়াল শহরে চার তলার এই বিশাল গুরুদ্বার। প্রায় ৪০০ বছর আগে তৈরি করা হয় এটি। মোট ১৬টি ঘর রয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরে তিনটি করে কারুকার্য করা দরজা এবং চারটি করে ভেন্টিলেটর ছিল। গুরুনানক-সহ বিভিন্ন হিন্দু শাসক এবং যুবরাজের ছবি টাঙানো ছিল দেওয়ালে। রাতে হানা দিয়েছিল একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। শাবল, গাঁইতি, কুড়ুল, কোদাল, তরোয়াল নিয়ে। প্রতি ঘরের দরজা, জানালা ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। বিনা বাধায় রাতভর ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। মূল্যবান কাঠ দিয়ে নির্মিত ও নকশা করা এই জানলা, দরজা চোর-বাজারে বিক্রি করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাক সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয়রাই জড়িত বলে সন্দেহ পুলিশ প্রশাসনের। যদিও স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতেই এই লুঠ হয়েছে।



পাক সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, ঐতিহাসিক ওই গুরুদ্বারটির অনেকটাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে তারা। খুলে নিয়ে গিয়েছে মূল্যবান কাঠ দিয়ে তৈরি জানলা, দরজাও। এলাকার মুসলমান ধর্মীয় স্থানগুলির সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব থাকে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে। তাদের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতেই গুরুদ্বারে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আশলাম জানিয়েছেন, পুরনো ওই বিল্ডিংটিকে 'প্যালেস অব বাবা গুরুনানক' বলা হয়। আমরা নাম দিয়েছি মহলান। ভারত তো বটেই, অন্য অনেক দেশ থেকেও শিখ ধর্মাবলম্বীদের আনাগোনা লেগে থাকত। কানাডা থেকে ছ'জনের একটি শিখ প্রতিনিধি দলও একবার এখানে এসে সবকিছু দেখে যান।' পাক টিভি চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে সম্প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মহম্মদ আশরফ নামের অপর এক ব্যক্তির দাবি, ''ওয়াকফ বোর্ডের সম্মতিতে প্রভাবশালীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। বিল্ডিং ভেঙে ইতিমধ্যেই নতুন নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এতবড় একটা গুরুদ্বার ভাঙার খবর পাওয়ার পরও প্রশাসনিক ব্যক্তিরা কেউ ঘটনাস্থলে আসেননি। পুলিশ নামমাত্র তদন্ত করে চলে গিয়েছে। পাক পত্রিকা 'ডন' জানিয়েছে, দেশভাগের সময় পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখরা ভারতে চলে এলে, তাদের ফেলে আসা সম্পত্তির তদারকির জন্য বিশেষ ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি) রয়েছে পাকিস্তানে। ঘটনার পর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কাদের হাতে গুরুদ্বারটির পরিচালনার ভার ছিল, তার কোনও রেকর্ড মেলেনি। রাজস্ব বিভাগের কাছেও গুরুদ্বারটি সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই বলে জানান নরোয়ালের ডেপুটি কমিশনার ওয়াহিদ আসগর। এই ঘটনার প্রতিবাদে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ মিছিল ও মৌন মিছিল বের হয় ভারতের পঞ্জাব রাজ্যের বিভিন্ন শহরে। ভারতের পঞ্জাব রাজ্যের গুরদাসপুর জেলায় অবস্থিত ডেরা বাবা নানক সৌধের সঙ্গে পাক পঞ্জাবের কর্তারপুরের দরবার সাহিব গুরুদ্বারকে সংযুক্ত করতে পাকা সড়ক ও পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়েই আলোচনা হয় এদিন। প্রতিকূলতা কাটিয়ে কীভাবে তা তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। তাতে যে একটা আবছা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তার সুর কাটল গুরু নানক প্যালেসে ভাঙচুরের ঘটনায়। এতে স্পষ্ট হলো, ইমরান মুখে বললেও তাঁর সরকার পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের পিঠ থেকে নামতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছাবার্তা অব্যাহত রয়েছে। মোদীকে টেলিফোনে সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন, কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি, জার্মানির চ্যান্সেলর শ্রীমতী আঙ্গেলা মেয়ারকেল, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী থেরেসা মে এবং শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী মাহিন্দা রাজাপাক্সে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের যুবরাজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব এবং উভয় দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্য প্রধানমন্ত্রী সৌদি যুবরাজের প্রশংসা করেন।

কাতারের আমীর প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও গভীরতর করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেদেশের আমীরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে মজবুত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে জর্মানির চ্যান্সেলর মেয়ারকেল দু'দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতাকে আরও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসারে তথা বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রীমতী মেয়ারকেল যে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছেন, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আগামী তিন বছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ-সহ এক কোটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজে আরও গতি আনতে কেন্দ্রীয় সরকার মূলত গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১ কোটি ৮০ লক্ষ নতুন গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই বাড়িগুলি বিদ্যুৎ এবং রান্নার গ্যাসের সংযোগ-সহ মানুষের ব্যবহারের জন্য তুলে দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। বাকি টাকা দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি। এই প্রসঙ্গে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'এই প্রকল্পে তৈরি প্রতিটি বাড়িতে কেন্দ্রের সৌভাগ্য যোজনার অধীনে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া, যেসব জায়গায় জলের সমস্যা নেই, সেখানে পানীয় জলের সংযোগও দেওয়া হবে।'



ওই আধিকারিক আরও জানান, কারা বাড়ি পাবেন তা ঠিক করার জন্য সরকার সোশিও-ইকোনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেনসাস ২০১১-র ওপর নির্ভর করবে ঠিকই কিন্তু যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য সরকার নিজেও বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, সেনসাসের তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট ৪.০৩ কোটি পরিবার কাঁচা ঘরে থাকে। এই তথ্য আগেই কেন্দ্র প্রতিটি রাজ্যের গ্রামসভাগুলিতে পাঠিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ২.৫৩ কোটি পরিবার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল। আগের বার যারা একটুর জন্য বাদ পড়েছিলেন সরকার বর্তমান প্রকল্পে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। বাড়াতে চায় বাড়ির সংখ্যাও। আগে বছরে ৪.৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি হতো। বর্তমান প্রকল্পে তৈরি হবে ৬ লক্ষ। এ বছরের গোড়ায় ৫,৬০,৬৯৫টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এরজন্য খরচ হবে ৩৩,৮৭৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৮,৪০৪ কোটি টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিভাজনের ভোটে শক্ত ঘুঁটি বাঙ্গলার ইমাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই ইমামভাতা চালু করেছিলেন। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাদ্রাসা পরিচালিত শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ। পশ্চিমবঙ্গ গত সাত বছরে প্রায় বধ্যভূমিতে পরিণত হলেও মুসলমানরা তাই মমতার দিক থেকে মুখ ফেরাননি। ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনেও তারা লড়ে গিয়েছেন। মুসলমানরা যাতে বুঝেশুনে ভোট দেন এবং কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দলকেই (পড়ুন তৃণমূল) দেন তার জন্য নির্বাচনের আগে দশ হাজার চিঠি বিলি করা হয়েছে। চিঠি লেখা হয়েছে উর্দু এবং বাঙ্গলায়। লিখেছেন অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের



প্রধান কারি ফজলুর রহমান। এই ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় রেড রোডে ইদের নমাজ পড়ার অনুষ্ঠান হয়। ফজলুর রহমান চিঠিতে লিখেছেন, 'গণতন্ত্রে নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই। পাঁচ বছর অন্তর আমরা সরকার নির্বাচনের সুযোগ পাই। এই কাজে কোনও ভুল হলে সেই ভুল সংশোধনের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। তাই ভোট দেবার আগে কোন দলকে দেবেন সে ব্যাপারে ভালো করে চিন্তা করুন।' পরে ফজলুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা মুসলমানদের ভেবেচিন্তে ভোট দিতে বলেছি। যাতে কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তির (পড়ুন বিজেপি) উত্থান না হয়।' চিঠিতে এও লেখা হয়েছে, মুসলমানরা যেন একটি দলকেই ভোট দেয়। তাদের ভোট যেন কোনওভাবেই ভাগ না হয়। কারণ ভোট ভাগ হলে তা 'দেশের ফ্যাসিস্ট শক্তিকেই সাহায্য করবে।' ফজলুর রহমানের সুচিন্তিত পরামর্শ, 'ভোট সবসময় যার জেতার সম্ভাবনা তাকেই দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে সেই সম্ভাবনা একমাত্র শাসক দলের। তাই মুসলমানদের উচিত শাসক দলকে ভোট দেওয়া।'

পোস্টাল ব্যালটে তৃণমূলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভোট পরিচালনা করেন যেসব সরকারি কর্মচারী তাঁরা ভোট দেন গোপন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। ভোট গণনার দিন পোস্টাল ব্যালট আগে গোনা হয়। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা গেছে, এবার পোস্টাল ব্যালট মারফত দেওয়া ভোটের সিংহভাগ পেয়েছে বিজেপি। তৃণমূল দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও বিজেপির তুলনায় তারা অনেক কম ভোট পেয়েছে। ১,০৮,২১০ জন পোস্টাল ব্যালট মারফত ভোট দিয়েছেন। বিজেপি পেয়েছে ৬৫,২৪৩টি ভোট। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ২৫,৭৯১টি ভোট। শতাংশের বিচারে যা মাত্র ২৩.৮৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৯টিতেই বিজেপির প্রাধান্য সুস্পষ্ট। রাজ্য সরকারের এক প্রবীণ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বোঝাই যাচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা তৃণমূল সরকারের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পোস্টাল ব্যালটে দেওয়া ভোটের ৫৮ শতাংশ পেয়েছিল। নবান্নের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার বেতনবৃদ্ধি নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ উসকে দিয়েছেন। সেই কারণেই তৃণমূলের খারাপ ফল। এক আধিকারিক বলেন, 'প্রায় প্রত্যেক সভাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারি কর্মচারীদের ঠিকমতো বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অনীহার কথা উল্লেখ করেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি রাজ্য সরকার যে এখনও কার্যকর করেনি, সে কথা মোদীর বক্তব্যে অনেকবার উঠে এসেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশন ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ ২০১৯-এর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কমিশনের সুপারিশ এখনও কার্যকর করা হয়নি। সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা বাড়াবার দাবি জানালে মমতা কুকুর বেড়ালের ঘেউ ঘেউ-মিউ মিউয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে মাত্র দু'বছর আগে ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরায় সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেছে বিজেপি সরকার। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে পোস্টাল ব্যালটে।

জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন পাকিস্তানের হিন্দুরা



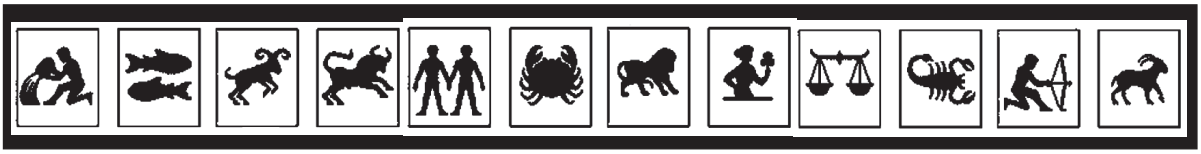
নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানের বাসিন্দা তিরানব্বই জন হিন্দু সম্প্রতি পুরীতে জগন্নাথদেবের দর্শন করতে এসেছিলেন। পাকিস্তান থেকে আসা দলটিকে প্রথম সংবর্ধনা জানায় ওঙ্কারনাথ মিশন। পরে, ওড়িশা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার। উল্লেখ্য, ওঙ্কারনাথ মিশনের উদ্যোগেই দলটি ভারতে এসেছে। ওঙ্কারনাথ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কিঙ্কর বিট্টাল রামানুজ মহারাজ বলেন, 'এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা সারা পৃথিবীকে শান্তির বার্তা দিতে চাই।' দলের অন্যতম সদস্য প্রভু সাই আত্মারাম বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে এসেছি। আমাদের মধ্যে করাচি, ইসলামাবাদের লোক যেমন আছে তেমনি সুদূর বালুচিস্তানের লোকও আছে। আমরা ভারতের তীর্থ করতে এসেছি।' দলটি হরিদ্বার হয়ে পুরীতে আসে। তারপর মথুরা- বৃন্দাবন দর্শন করে। দলের প্রতিটি সদস্য ভারতের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অযোধ্যার শ্রীসীতারাম মন্দিরের পক্ষ থেকে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত যুগলকিশোর বলেন, 'তিন বছর ধরে আমরা ইফতার পার্টির আয়োজন করে আসছি। ভবিষ্যতেও করব। ভারতের প্রতিটি উৎসব আমাদের সবাই মিলে পালন করা উচিত।'

ইফতার পার্টিতে যোগ দেওয়া মুজাম্মিল ফিজা জানান তিনিও প্রতি বছর হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে নবরাত্রি পালন করেন।

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৫।।



সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



৩ জুন (সোমবার) থেকে ৯ জুন (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে শুক্র, বৃষে রবি, মিথুনে রাহু, মঙ্গল, বুধ, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। পুনরায় ৪ জুন, মঙ্গলবার রাত্রি ১০টা ২ মিনিটে শুক্রের বৃষে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে রোহিণী নক্ষত্র থেকে সিংহে মঘা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ ভ্রাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি, সহযোগিতা, নিকট ভ্রমণ। বাক্‌পটুতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তায় কর্মে সাফল্য, ব্যবসার সম্প্রসারণ, গৃহ সরঞ্জাম ও বিলাসিতায় ব্যয় বাহুল্য। বিদ্যার্থীর বুদ্ধি ও চিন্তার উৎকর্ষতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলবতী। শরীরের মধ্যভাগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

বৃষ ঃ ক্রোধ, কটূবাক্য, মানসিক অস্থিরতা, বিসদৃশ আচরণে সু-সম্পর্কে ফাটল, আশু সম্পন্ন কর্মে বিঘ্ন। মানসিক অবসাদে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। ভ্রাতৃপীড়া, গৃহপশু ও মিত্রহানি, চৌরভয়, ভূমি নাশ। সপ্তাহের শেষে গুরুজনের পরামর্শে দগ্ধ হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ।

মিথুন ঃ নীতিনিষ্ঠ, মানবহিতৈষী, দরদি নামে প্রতিষ্ঠিত। বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন। স্ত্রীর পেশাগত প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ও সামাজিক গৌরব প্রাপ্তি, কর্মপ্রার্থীদের কর্ম করায়ত্ত হয়েও আশাহত হওয়ার সম্ভাবনা। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক ও বাক্‌সংযমী হওয়া দরকার।

কর্কট ঃ আর্থিক ও পারিবারিক সুস্থিতি, মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ, অদ্ভুত আচরণ ও অসৎকর্মে লিপ্ততা। পশুপালক, কাঠ, পাথর, খনিজ, হোটেল ব্যবসায় প্রতিপত্তি ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আত্মবিশ্বাসের অভাব হেতু অনীহা, বিষয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। অপ্রত্যাশিত আইনি/পুলিশি ঝামেলা ও গর্ভাশয়ের সমস্যায় যত্নের দরকার।

সিংহ ঃ অবিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গ ও বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের পরিচয়। কর্মকুশলতায় আনন্দ সত্ত্বেও অতিরিক্ত চাপ ও ব্যস্ততায় ক্লান্তি। স্বজন সম্পর্ক ও আত্মীয় বৎসলতায় ব্যাপৃত মন। জমি-বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি। রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিতে কষ্ট হবে।

কন্যা ঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, নম্রতা, শিষ্ঠাচার, সৌজন্য ও শিশুর সারল্যে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন যা পারিবারিক গর্ব ও গৌরবের বিষয়। নিজ বুদ্ধি ও কারিগরি দক্ষতার মেলবন্ধনে অর্থাগমের বিকল্প পথের সন্ধান। নিজের সুস্পষ্ট ভাষণে আকর্ষণ বৃদ্ধি, বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য। প্রেমজ ব্যাপারে হঠকারিতা পরিহার করুন।

তুলা ঃ পারিবারিক অসুস্থতা, অবাঞ্ছিত মন্তব্যে সংযত ও ধৈর্যের সঙ্গে চলতে হবে, অন্যথায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হবে। বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনে অমনোযোগিতা ও উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ছিদ্রান্বেষী ও যুবক মিত্র উদ্বেগের কারণ। বিজাতীয় সংস্পর্শ ও কুহকিনীর মায়াজালে সময়ের অপচয় ও সম্মান হানি।

বৃশ্চিক ঃ বিদ্যা, কর্ম, নতুন উদ্যোগে ক্রমবর্ধমান বাধা। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুক্তি, তবে আর্থিক পরিকাঠামো দুর্বল। পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ, চর্ম, পশম ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুভ। মূত্রগ্রন্থি, হৃদযন্ত্র ও রক্তচাপের চিকিৎসা দরকার।

ধনু ঃ কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে জটিলতার অবসান। জনকল্যাণমূলক কর্মে ভালো সুহৃদ সম্পর্ক, পরিচিতি বৃদ্ধি। আর্থিক ও পেশাগত বিভিন্ন যোগাযোগ বাস্তবায়িত হবে। ভ্রমণ ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। কীটপতঙ্গজনিত বিষক্রিয়া ও পতনজনিত আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

মকর ঃ প্রিয়জনের নির্মম ব্যবহার, বিরোধিতা, চক্রান্ত, কর্মস্থানে চাপ ও ব্যস্ততায় মানসিক ক্লেশ। সন্তানের বেপরোয়া চালচলনে ঝুটঝামেলা ও প্রতিবেশীর বিরূপতা। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও অবৈধ প্রেমজ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। পিতৃ বিত্ত লাভ, অবিবাহিতের হঠাৎ বিবাহের যোগ।

কুম্ভ ঃ মনের পোষিত বাসনার পূর্তি। বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে নতুন চিন্তাভাবনায় উচ্চপদে উন্নীত ও বিজয়ীর সম্মান। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুলীর প্রতিভার ব্যপ্তি, শংসা, প্রতিষ্ঠা।

মীন ঃ উদ্যম, অধ্যাবসায়, কারিগরি দক্ষতা ও হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সামাজিক ও বরণীয়বর্গের কর্তব্য পালন, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। পেশাগত প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও আর্থিক সাফল্য আশাব্যঞ্জক নহে। গুরুজন, দেব-দ্বিজে ভক্তি ও সমাজ কল্যাণে দান-ধ্যানে ব্যাপৃত মন। ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চলতে হবে।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য